সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • এপ্রিল ২০১৫

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা

ভূগর্ভস্থ যাদুঘর, পাবলিক লাইব্রেরি ও চারুকলা ইনস্টিটিউট

রং ও রূপের চিত্রল কাব্য

আর্সেনিক দূষণ ও পরিশোধন

রবীন্দ্রনাথের গল্প তোতা-কাহিনী

শিক্ষালোক

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

সম্পাদকীয়

এপ্রিল ২০১৫ ● ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আর কদিন পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবি ও জগতের সেরা মনীষীদের একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। জমিদারির কাজে তিনি বহুদিন এই বাংলাদেশে থেকেছেন। পূর্ববঙ্গের রূপ ও পদ্মার ঢেউ তাঁকে মোহিত করেছে। কুষ্টিয়া ও পাবনায় থাকাকালীন যে জীবনযাপনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন তার অনবদ্য প্রতিফলন হয়েছে তাঁর গল্পে ও কবিতায়। জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ শিলাইদহে তাঁর সাহিত্যচর্চা নিয়ে এবার একটি লেখা ছাপছি। আর শিক্ষা বিষয়ে তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প।

তোতাকাহিনী গল্পটি ১৯১৮ সালে 'সবুজ পত্র'-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। বলা যায়, আর তিন বছর পর এর শতবর্ষপূর্তি। অথচ গল্পটিকে এখনো কত নতুন মনে হয়। কারণ শিক্ষার যে সংকট এখানে তুলে ধরা হয়েছিলো তা আজো একইরূপ আছে। সংকটের মূল রূপটি হলো, কিছু বিশেষ ধ্যানধারণা ও তথ্য দিয়ে শিশুর মগজ ভরাট করা যার মাধ্যমে তার স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা লোপ পায়। বোঝার সুবিধার জন্য যত মোটা দাগে এটি বলছি বা কবিগুরু তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন, ঘটনাটি তার চেয়ে অনেক সূক্ষ্মতর উপায়ে হয় যদিও ফল প্রায় একই। ভিতর থেকে স্বাধীন সৃষ্টিশীল মনটি মরে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে যারা নীতিনির্ধারক তারা একটা সমাধান বের করবেন, এই আমাদের আকাঙ্খা।

বুলেটিনের মার্চ সংখ্যাটি বাদ দিচ্ছি। পানিতে আর্সেনিক দূষণ, শিশুদের ভালভাবে পড়ানোর কৌশল ইত্যাদি নিয়ে লেখা ছাড়াও ক্রিকেট নিয়ে একটি লেখা প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের ছেলেরা যে এখন বিশ্বপরিমণ্ডলে ভাল করছে সেই আনন্দে এবার অংশ নিচ্ছি।

সম্পাদক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

প্রচ্ছদের ছবি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা
(অন্তর্জাল থেকে নেওয়া)

শেষ পৃষ্ঠার ছবি
শিল্পী বিজয় চন্দ

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ম্যাস্-লাইন কমিউনিকেশনস্ লি.
ফোন : ৯১০৪৬৩৭
ই-মেইল : office@masslinebd.com

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩।
Email : cdipbd@yahoo.com, web: www.cdipbd.org

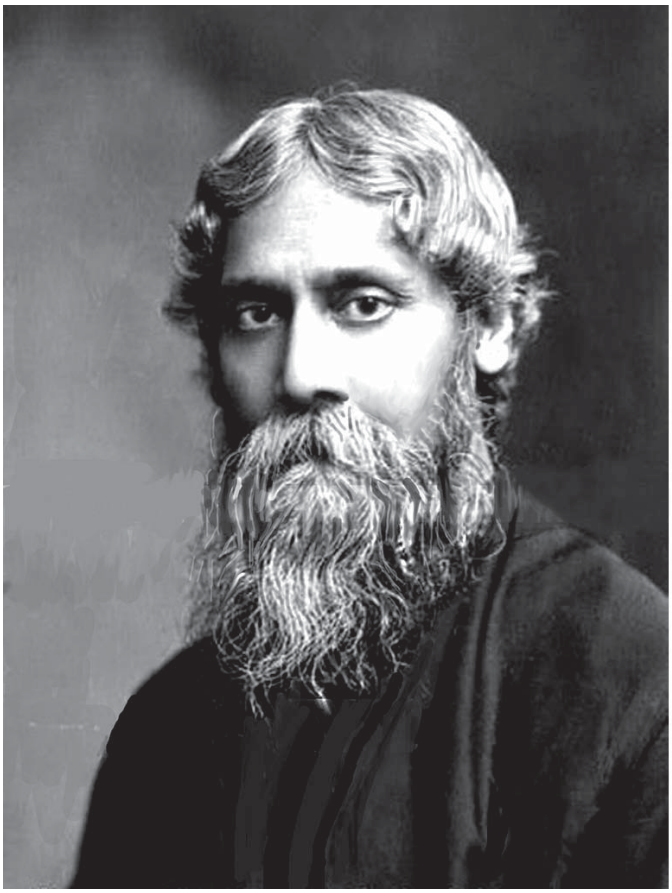

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা

সালেহা বেগম

প্রকৃতিপ্রেমী ও মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী এবং বিস্তৃত। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর, সমাজসংস্কারক এবং চিন্তাবিদ। রবীন্দ্রজীবনবোধ নানা বিচিত্রতা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাত্রায় বিকশিত হয়েছে। শিলাইদহ ও পতিসর এলাকায় দীর্ঘদিন অবস্থান কবির চিন্তাভাবনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। একদিকে সৌন্দর্য পিপাসু কবির নতুন নতুন কাব্যচিন্তায় বিভোর হয়ে সাহিত্য রচনা, অন্যদিকে জনদরদী কবির সমাজ উন্নয়ন ও জনহিতকর কাজে সম্পৃক্ত হয়ে বিপুল কর্মযজ্ঞ সৃষ্টি। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট নিয়েই মূলত আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে অল্প সময়ের জন্য একবার এসেছিলেন তাঁর পিতার সহযাত্রী হয়ে। এরপর ১৮৭৬ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারি দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে বেড়াতে এসেছিলেন।[১] পিতৃ জমিদারি দেখাশুনা করার দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় কাটিয়াছেন কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, পাবনার সাজাদপুর এবং রাজশাহীর পতিসরে।[২] শিলাইদহ গ্রামের উত্তরে পদ্মা এবং পশ্চিমে গড়াই নদী প্রবাহিত। দুটি নদী শিলাইদহকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে বসবাস করতেন। মাঝে মাঝে পদ্মানদীতে বোটে কখানি বই নিয়েও অবস্থান করতেন। সপরিবারে তিনি ১৮৯৮ সালে এই কুঠিবাড়ীতে উঠে এসেছেন এবং থেকেছেন ১৯২২ সাল পর্যন্ত সময়।

---

১ রবি জীবনী; প্রশান্ত কুমার পাল, প্রথম খন্ড
২ ভিন্ন ভুবনে রবীন্দ্রনাথ; সুশান্ত সরকার, মাঘ, ১৪১৪

কলকাতায় অভিজাত ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা সংস্কৃতিতে তিনি লালিত হয়েছেন এবং কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন সেখান থেকেই। তবে তাঁর কাব্যচর্চা ও সাহিত্য প্রতিভার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটেছে বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে এসে স্থায়ী হয়ে বসার পরই। এখানকার প্রাকৃতিক নিসর্গরূপ, চঞ্চলা পদ্মা নদী, দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত, সুবিশাল নির্মল নীলাকাশ, অবারিত নদী তীরের বালুচর, গ্রামবাংলার কাশবন, পুকুরপাড়, ডোবা-নালা, গ্রামের সরু পথ, বর্ষণ-স্নিগ্ধ অপরাহ্ন বেলা, দুপুরের নিস্তব্ধতা, সন্ধ্যার শেয়ালের ডাক ও সন্ধ্যাবেলার শাঁখের আওয়াজ সেই সাথে দুঃখে পীড়িত ও অভাবক্লিষ্ট অথচ শান্ত-সহিষ্ণু গ্রামবাসী কবির মনোজগতে বিমুগ্ধ বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জাগ্রত করে তোলে। এতদিন তাঁর জীবনে এসব কিছু ছিল আড়ালে, তাঁর চিত্তে এসব নিয়ে কোন অনুভূতি ছিল না। আজ পদ্মার তীর থেকে 'এই মানবজীবন' কবির মনের অর্গল দুহাতে ঠেলে তার অন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করল। অংশুমান পাল লিখেছেন, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় যোগ ও আত্মীয়তাবোধের পরিচয়, পদ্মাবিধৌত বাংলার বাইরের ও অন্তরের পরিচয়, তার দুই তীরে স্পন্দমান মানব হৃদয়ের পরিচয় – একসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে তখনকার অহস্র ছোটগল্পে ও ছিন্নপত্রে পাতায় পাতায়।[৩]

রবীন্দ্র গবেষকগণ কবির রসবোধের এই রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তারা নিজেদেরই প্রশ্ন করেছেন এই ভূখণ্ডে কি এমন আদিম প্রাণের ভূমিকা সঞ্চিত ছিল যার স্পর্শ এক মহাকবিকে তাঁর বিধিনির্দিষ্ট পথের উপর এনে দাঁড় করিয়ে দিল। আবার নিজেরাই এর জবাবে বলেছেন – কবি প্রতিভা এতকাল অসহায়ভাবে যোগ্য আসনটি হাতড়িয়ে বেরিয়েছেন, এঁকেছেন কল্পনায় বিচরণকারী নর-নারী যারা কোন বিশিষ্ট দেশের অধিবাসী নন, কিংবা অনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক জগতের অস্পষ্ট প্রেতমূর্তি মাত্র। হঠাৎ তাঁর সম্মুখে উদঘাটিত হয়ে গেল human habitation and name"-এর বাস্তব পৃথিবী। ফলে রঘুপতি, জয়সিংহ, রুক্মিনী ও উদয়াদিত্যের স্থানে দেখা দিল - রাইচরণ, রতন, মৃন্ময়ী, পুঁটু আর বেদের মেয়ে। কবির লেখনীতে সত্য হয়ে উঠল শৈশব-সন্ধ্যা, যেতে নাহি দেব, মধ্যাহ্ন আরো অনেক গল্প ও কাহিনী। মনে হলো বাংলাদেশের এই ভূখণ্ড ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে অমৃত নিয়ে অপেক্ষা করছিল আর কবি সেখানে পৌঁছাতেই তাঁর ভালে অঙ্কিত করে দিল অমৃতের টীকা।[৪]

সৈয়দ মুর্তাজা আলি লিখেছেন - কবি যখন পরিবার-পরিজন নিয়ে শিলাইদহে এসে বসবাস করেন তখন তাঁর পাঁচ পুত্র-কন্যাই জীবিত। তাঁর দাম্পত্য জীবনের এক মধুময় অংশ কাটে শিলাইদহে। তাঁর সাহিত্যের ও হৃদয় মনের বিকাশ ঘটে এই সময়। এখানেই তিনি কুষ্টিয়া এলাকার বাউল ও সাধকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার সুযোগ পান ও বাংলার পল্লী-হৃদয়ের ও মরমী কবিদের অন্তরের কথা অনুধাবন করেন। শহরের জটিলতা ও কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তাঁর পারিবারিক জীবন অনাবিল ও সুখময় ছিল। তাঁর এই মধুময় পারিবারিক জীবনের ফলশ্রুতি তাঁর অমর সাহিত্য অবদানে প্রতিফলিত হয়েছে।[৫]

> এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে, বেশ কৃশকায় হয়ে এসেছে, একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো নরম শাড়ী গায়ের সংগে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভংগীতে চলে যাচ্ছে আর শাড়ীটি বেশ গায়ের গতির সংগে সংগে বেঁকে যাচ্ছে। অমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমার ধারণা বাবার গদ্য ও পদ্য দু'রকম লেখার উৎসই যেন খুলে গিয়েছিল শিলাইদহে। এমন আর কোথাও হয়নি। এই সময় তিনি অনর্গল কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প লিখে গেছেন – একদিনের জন্যও কলম বন্ধ হয়নি।"[৬]

বাংলার এই অঞ্চলে তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে ছিন্নপত্রের মাধ্যমেই তিনি প্রকৃতির মনোহর রূপ বর্ণনা করেছেন শুরু থেকেই। 'ছিন্নপত্রাবলী'র মাধ্যমে "পত্রসাহিত্যের" নামে নতুন এই সাহিত্য সংযোজন করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। এছাড়াও গল্পগুচ্ছের অনেক গল্প, বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এই অঞ্চলের প্রকৃতি ও জনপদকে অবলম্বন করে। প্রবন্ধের পরের অংশে এর কিছু উল্লেখ রয়েছে।

মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন, 'এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ঐ নদীকূলেই কবির জীবনের সবচেয়ে বড় অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল। চারপাশের সুখ-দুঃখ, জীবন

৩ "বাংলাদেশের হৃদয় হতে", রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ, অংশুমান পাল, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৭৯ বাংলা।
৪ শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, নবম মুদ্রণ, ১৪১৪ বাংলা।
৫ সাহিত্যতীর্থ শিলাইদহে, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ, সৈয়দ মুর্তাজা আলি, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৭৯ বাংলা।
৬ পিতৃস্মৃতি, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা, ১৯৪৫ইং।

সংঘাত থেকে বিচ্ছিন্ন, চাঁদের পানে চক্ষু রাখা নয়; নদীর কলধ্বনি মেশান মানুষের ছোট ছোট কলগানই কবির জীবনের সেই বৃহৎ অধ্যায়ের ভূমিকা।'[৭]

পদ্মা তীরের জীবনের নানা অনুষঙ্গ তিনি তুলে ধরেছেন বিভিন্ন জনের কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে। এর মধ্যে পদ্মার সীমাহীন অপরূপ রূপের বর্ণনায় কবির অন্তরের গভীর ও একান্ত অনুভব রয়েছে। ছিন্নপত্রের প্রথম কখানি ছাড়া সব চিঠিই ইন্দিরা দেবীকে লেখা। ইন্দিরা দেবী ছিলেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী। এই চিঠিগুলো তিনি প্রায় আট-নয় বছর ধরে লিখেছেন। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ থেকে তেত্রিশের মধ্যে আর ইন্দিরা দেবীর বার থেকে বিশ। শিলাইদহের অবারিত মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি – যেখানে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, উন্মুক্ত নীল আকাশ, নদীর কুলকুল ধবনি কবি চেতনায় ভিন্ন এক বার্তা এনে দেয়, স্তব্ধ নির্জনতা, সীমাহীন আকাশ এক উদাসীনতার জন্ম দেয় কবি মনে আর সে ভাবের মধ্যে নিমগ্ন থেকে কবি তাঁর মনের নিগূঢ় সত্য উদঘাটন করেছেন। তাই সেখান থেকে লেখা চিঠিগুলোতে এর প্রকাশ গভীরভাবে অনভূত হয়। তেমন মনে হয় অন্য কোথায়ও হয়নি। তবে কবির জীবনের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ কখনোই কাব্যে ব্যক্তিগতভাবে করেননি, যখন জীবন ভোগের রস সকলের হয়ে উঠত তখনই কেবল তা তাঁর কাছে কাব্যের যোগ্য বলে সাহিত্যে স্থান পেত। আমরা তাই কাব্যে তাঁর জীবনটি ঠিক স্পষ্টভাবে খুঁজে পাই না। তিনি জানতেন তাঁর সুখ-দুঃখ তাঁর নিজেরই কিন্তু সেই সুখ-দুঃখ ভেদ করে যে ভাব উঠছে তা সকলের।

পদ্মার বিস্তৃত ও নিভৃত চরের নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য উৎসরণের মধ্যে বসে, কখনও বা জমিদারির কাজে তাঁর কাছে আসা সহজ-সরল গ্রামের মানুষের সাথে আলাপচারিতা এবং সম্ভাষণ বিনিময়ের সময় তিনি তাদের আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে নিজের মনে প্রতিদিনের চিন্তা-ভাবনার জাল বুনতেন। আর এই আবেগ অনুভূতিগুলোই বের হয়ে আসত সেই চিঠিগুলোতে। প্রকৃতির সাথে এমন আত্মিক যোগের সহজ সরল প্রকাশ চিঠি ছাড়া যেন অন্য কোথাও হতে পারত না। এক সময় কবি ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে তাঁর চিঠিগুলো চেয়ে নিলেন। ইন্দিরা দেবী তা থেকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়গুলো বাদ দিয়ে কবিকে দিলেন। কবি আবার সেই চিঠিগুলো থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে 'ছিন্নপত্র' নামে প্রকাশ করলেন। ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় জীবন ও সৌন্দর্যের বর্ণনায় রয়েছে কবির মনের গভীর বোধের তাৎপর্যময় প্রকাশ।

শিলাইদহের প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে বিচিত্র বর্ণালী কবি দেখেছেন তা অন্তর্লোকে নিমগ্ন হয়ে মনন করেছেন – চোখে যা দেখেছেন, যা ঘটেছে সেসব ছাড়িয়ে অন্তরের সত্যকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। গভীর চিন্তার সূত্র ধরে পৌঁছেছেন জ্ঞানালোকে। যেমন – গ্রামের ঘাটে বাঁধা থাকত বোট, কবির উপলব্ধিতে অনুপ্রবেশ করতো অবারিত ধানের ক্ষেতের উত্তাল বাতাস, মিষ্টি মৃদু ঘ্রাণ ভরিয়ে দিত তাঁর অন্তর, ঘননীল আকাশে নানা বর্ণের ফুলঝুরি পুলকিত করত তাঁকে, জোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রিতে কবি আপন মনে ডুবে যেতেন জীবনভোগের আনন্দোৎসবে। তাই তিনি লিখেছেন, 'এই সুন্দর শরৎ প্রভাতের সংগে, এই জ্যোতির্ময় শূন্যের সংগে আমার এই যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রত্যক্ষ ভাষা এই বর্ণ-গন্ধ-গীত।'

কতভাবেই যে কবি পদ্মাকে উপলব্ধি করেছেন তা প্রকাশ পায় তাঁর লেখাতে। তিনি লিখেছেন, 'কাল খানিক রাত্রে জলের শব্দে আমার ঘুম ভেংগে গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ এক তুমুল কল্লোল এবং প্রবল চঞ্চলতা উপস্থিত হয়েছে। বোধ হয় অকস্মাৎ একটা নতুন জলের স্রোত এসে পড়েছে। রোজই প্রায় এরকম ব্যাপার ঘটছে। ঠিক যেন আমি সমস্ত নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছি। কাল অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ একটা চঞ্চল উচ্ছ্বাস এসে নাড়ির নৃত্য অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল।"[৮]

এক জায়গায় কবির স্বীকারোক্তি: 'বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড় ভালবাসি। ... এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে, বেশ কৃশকায় হয়ে এসেছে, একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো নরম শাড়ী গায়ের সংগে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভংগীতে চলে যাচ্ছে আর শাড়ীটি বেশ গায়ের গতির সংগে সংগে বেঁকে যাচ্ছে। অমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো, অতএব তাঁর কথা যদি কিছু বাহুল্য করে লিখি তবে সে কথাগুলো চিঠিতে লিখবার অযোগ্য মনে করা উচিৎ হবে না।'[৯]

শিলাইদহের গ্রাম সম্পর্কে লিখেছেন: 'এতদিন সামনে ঐ দূর গ্রামের গাছপালার মাথাটা সবুজ পল্লবের মেঘের মতো দেখা যেত, আজ সমস্ত বনটা আগাগোড়া আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। ডাঙ্গা এবং জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মত অল্প অল্প করে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্ছে। লজ্জার সীমা উপচে এলো ব'লে প্রায় গলাগলি হয়ে এসেছে।'[১০]

শুধু প্রকৃতিই নয়, জীবন ও জনপদ নিয়েও ছিল রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ যা গভীরভাবে তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে এবং গল্প-কবিতায় স্থান পেয়েছে। বাংলার গ্রামের গরীব দুঃখী,

৭ বাংলার মাটি ও বাংলার জল, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ, সম্পাদনা: অসীম রাহা ও মৈত্রেয়ী দেবী, বৈশাখ, ১৩৭৯

৮ ছিন্নপত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১০ই আগস্ট ১৮৯৮, শিলাইদহ

৯ ছিন্নপত্র, ২রা মে ১৮৯৩

১০ ছিন্নপত্র, ৩রা জুলাই ১৮৯৩

সুখ-দুঃখ কাতর মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসা ও সমবেদনা, যদিও তারা শিক্ষিত, সুসভ্য, ধনী এবং মার্জিত ছিলেন তা নয়। তাঁর লেখাতে এর প্রকাশ পাওয়া যায়: 'আমার কাছে এই সব সরল বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত প্রজাদের মুখে বড়ো একটা কোমল মাধুর্য আছে। বাস্তবিক এরা যেন আমার দেশজোড়া এক বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায়, নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর, সরল চাষাভূষোদের আপন লোক মনে করতে একটা সুখ আছে - এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য সহকারে সয়েছে তবু তাদের ভালবাসা কিছুতে ম্লান হয়নি। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভাল মনে হয় তা এরা জানে না।'[১১]

কবি গ্রামের সরল মানুষগুলোর হৃদয়ের মধ্যে দেখেছেন স্নেহের সুধা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির অপরূপ সৌন্দর্য। তাঁর হৃদয়ও বিগলিত হয়ে পৌঁছেছে তাদের হৃদয়ের কাছে। অনেক ঘটনা এমনভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছে যে তিনি লিখেছেন: 'এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, এদের সরল ছেলেমানুষের মত আবদার শুনলে মনটা আর্দ্র হয়ে উঠে, যখন তুমি বলতে তুই বলে, যখন আমাকে ধমকায় ভারী মিষ্টি লাগে।'[১২]

ছিন্নপত্রে মূলত তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া ছবি অন্যটি বাংলাদেশের অপরূপ সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি এবং তৃতীয়টি এই দুই-এর সঙ্গমে উদ্ভূত কবির মনন ও তত্ত্ববাণী। এই তিন দিক কবির তখনকার জীবনে ও পরবর্তীকালের জীবনসাধনায় এবং কর্ম-সাধনায় গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আর তারই কারণে রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে জীবন ও জীবনের মধ্যে সাহিত্যবোধ কেমন করে প্রবেশ করেছে তা পরিষ্কার করে জানা যায়। এমনকি বহু কবিতার ভাব, অর্থ, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি এবং কোন অভিজ্ঞতা থেকে তাদের জন্ম তাও জানা যায়। কবি তাঁর চোখের দৃষ্টির সঙ্গে যোগ করেছেন কল্পনা ও দিব্যদৃষ্টি। এই তিন দৃষ্টির ভিতর দিয়েই উদঘাটিত হয়েছে রবীন্দ্র জীবনবোধের গভীর উপলব্ধি।

প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, রবীন্দ্রজীবনের চতুর্থ দশকটি তাঁর কবি জীবনের সফলতম কাল। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, তৃতীয় দশক থেকেই রবি প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে। এই দশকের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়েছে রাজা ও রাণী, বিসর্জন ও মানসী। তবে চতুর্থ দশকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির যে সোনার ফসল ফলেছে তার তুলনা হয় না। শিলাইদহের প্রথম ফসলের মধ্যে ছিল সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি। এই তিনটি কাব্যেই প্রধান বিষয় নদী, নৌকা ও মাঝি। সোনার তরীর মোট তেতাল্লিশটি কবিতার মধ্যে তেরটিতে রয়েছে

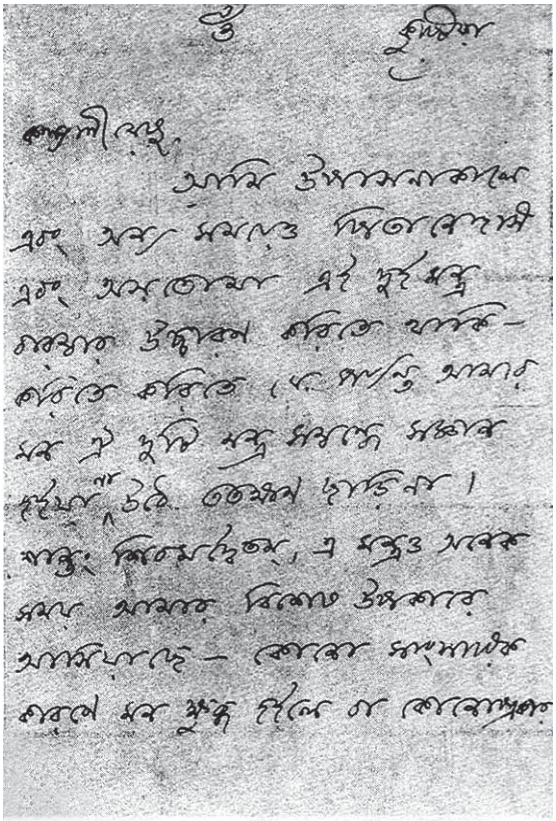

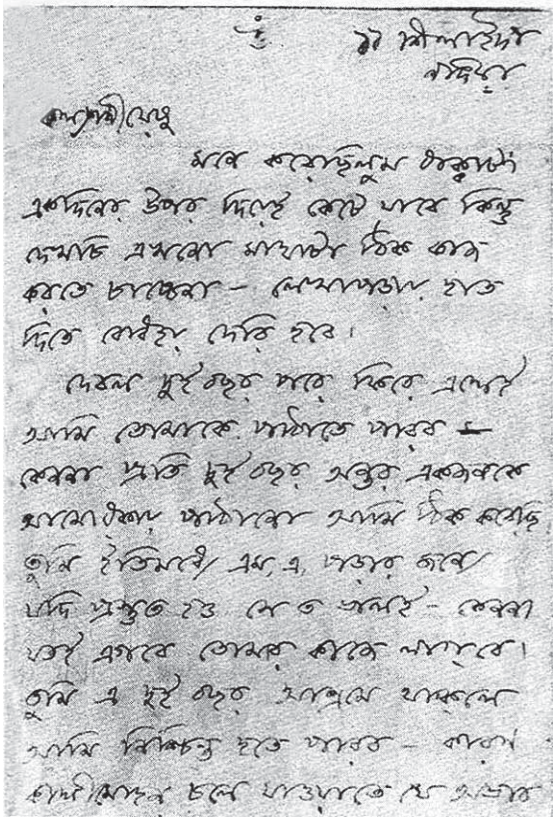

১১ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ, মৈত্রেয়ী দেবী, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৭৯ বাংলা।
১২ পূর্বোক্ত

হয় নদী, নয় সমুদ্র, নয় নদী তীরের গ্রাম। চিত্রা কাব্যে চৌত্রিশটি কবিতা। এতে নদীময় কবিতার সংখ্যা মাত্র চার-পাঁচটি। কবির দৃষ্টি তখন নদীর চেয়ে নদী তীরের দিকে ধাবিত হয়েছে। কারণ সে সময় বর্ষার বেগ কমে এসেছিল। কবিতায় তখন নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছে – অন্তর্যামী, জীবন দেবতা, সাধনা, সিন্ধুপারে, মৃত্যুর পরে, উর্বশী ইত্যাদি কবিতায়। চিত্রার অন্য কবিতা প্রেমের অভিষেক, স্বর্গ হতে বিদায়, এবার ফিরাও মোরে, সন্ধ্যা ইত্যাদির কাহিনী ও প্রেরণা স্থানীয় অভিজ্ঞতার ফসল বলেই মনে হয়। চিত্রা নিটোল সৌন্দর্যবোধের কাব্য; এর শ্রেষ্ঠ কবিতা উর্বশী, জ্যোৎস্না রাত্রে ও বিজয়িনী। চৈতালিতে নানা বিষয়ের কবিতা রয়েছে; কালিদাস সম্পর্কিত বেশ কটি কবিতা, ভ্রান্ত-বৈরাগ্য, দেবতার বিদায়, সামান্য লোক, দুর্লভ জন্ম, দিদি, পুঁটু ইত্যাদি। চৈতালি কাব্য পদ্মার মানুষ ঘেঁষা রূপ। গদ্য কবিতার প্রাণময় প্রকাশ চৈতালি কাব্যে গ্রথিত হয়েছে।[১৩]

কবির চতুর্থ দশকের বিশিষ্ট ফসল গল্পগুচ্ছ। প্রমথনাথ বিশী তাঁর লেখায় বলেছেন – পদ্মানদী বিশেষভাবে রবীন্দ্র প্রতিভার বাহন, যেমন গঙ্গানদী ছিল বঙ্কিম প্রতিভার বাহন। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট গল্পের পট বা পাত্র পদ্মা তথা নদীপাড়ের জনপদের ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা হয়েছে। ১৮৯১ সালে তাঁর গল্পপ্রবাহের সূত্রপাত হয়েছিল এবং তা সাময়িক ছেদ পড়লেও প্রবাহমান ছিল ১৯৪০ সাল পর্যন্ত। তাঁর ছোটগল্পের বুনন মানবজীবন ও প্রকৃতির টানাপোড়েন নিয়েই রচিত হয়েছে। একটি সূত্র হয়েছে মানুষের সুখ-দুঃখ থেকে আরেকটি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্য থেকে। পল্লীগ্রামের মৃন্ময় অংশ বাদ দিলে 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ী অসম্পূর্ণ থাকত। পল্লীগ্রাম ও নদী বাদ পড়লেও 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটি হত অতি সাধারণ গল্প। পদ্মার রহস্যময় রাক্ষসী ক্ষুধার উপরেই খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পের ভিত্তি। মেঘ ও রৌদ্র গল্পে প্রকৃতির মেঘ ও রৌদ্র সমানভাবে মিলে মিশে গেছে। শুভা গল্পে পল্লীগ্রামের নদীতীরের মেয়ে শুভা প্রকৃতির মতই ভাষাহীন ছিল তাই দুজনেই বেশ মিলেমিশে ছিল। শহরে এনে তাকে বিয়ে দেওয়ার পরই মেয়ে যে বোবা ধরা পড়তে দেরি হলো না। ফলে বোবা মেয়েকে নিয়ে যত বিপত্তি। ছুটি গল্পে গাঁয়ের ছেলে ফটিক বেশ আনন্দেই দিন কাটিয়েছে, পড়াশুনার জন্য শহরে পাঠানোর পর সে গাঁয়ের কথা কিছুতেই ভুলতে পারেনি। শহরের পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় অতিথি গল্পের তারাপদকে। কিছু কিছু গল্পে পল্লী-প্রকৃতির চেয়ে পল্লীর মানুষের বৃহত্তর ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। দিদি, মহামায়া, জীবিত ও মৃত প্রভৃতি গল্পের খসড়া গাঁয়ের বাতাসে ভেসে বেড়ায়; গাঁয়ে যেসব কানাঘুষা হয় কবি সে সব কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছেন। শাস্তি গল্পের মূল ঘটনাটি বা তার অনুরূপ কোন ঘটনা হয়তো জমিদার কাছারিতে বিচারার্থে এসেছিল। চৈতালির অনেক কবিতার সঙ্গে এই দশকের অনেক গল্পের মিল ছিল। আবার শুভা, শুভদৃষ্টি ও এক রাত্রির মতো গল্প অতি অনায়াসে কবিতায় রূপান্তরিত হতে পারত।[১৪]

ক্ষণিকা, কল্পনা, কথা ও কাহিনী, নৈবেদ্য শিলাইদহ-বাসের শেষ কাব্যফসল। এগুলো প্রকাশিত হয়েছে ১৯০০-১৯০১ সালের মধ্যে। তবে এর সবগুলোই যে শিলাইদহ-বাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব তা বলা যায় না। তবু এসব কাব্যে পল্লীদৃশ্য ও জীবনযাত্রার প্রতিফলন রয়েছে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে। এসব কাব্যের মূল কাহিনী ছিল এমন - রথযাত্রার মেলায় তালপাতার বাঁশির সুরে শিশুটির আনন্দ, একটি রাঙা লাঠি কিনতে না পারায় অন্য শিশুর দুঃখ, মাঠের পথে ক্ষণিক দেখার বিহ্বলতা, সর্ষেক্ষেত্রে মৌমাছিদের গুঞ্জন, জলের ধারে বেঁকে পড়া খেজুর গাছটির উপর মাছরাঙা পাখিটি, ঘোর বর্ষায় ভূলুণ্ঠিত রজনীগন্ধা ফুল, মেঘমুক্ত প্রভাতের স্নিগ্ধ প্রশান্তি ইত্যাদি। আষাঢ় মাসে বর্ষণমুখর দিনে কবি লিখেছেন -

পূবে হাওয়া বয় কূলে নাই কেউ,
দুকূল বাহিয়া ওঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল
ছলছল ওঠে বাজিরে –

কথা ও বাহিনী কাব্যের কাহিনী অংশের গানভঙ্গ, পুরাতন ভৃত্য ও দুই বিঘা জমিতে শিলাইদহ অঞ্চলের প্রভাব অত্যন্ত পরিষ্কার।

রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোট গল্পের বিষয়বস্তু শিলাইদহ অঞ্চলের ঘটনা থেকে নেয়া হয়েছে। তাঁর ছোট গল্প 'জীবিত ও মৃত'-র ভিত্তি শিলাইদহের একটি ঘটনা। 'বৈষ্টমী' গল্পের আখ্যানবস্তু সর্বক্ষেপী নামক এক স্থানীয় বৈষ্ণবীর জীবন থেকে নেয়া।

প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প' লেখায় বলেছেন, "১৮৯১ সাল (বাংলা ১২৯৮) হইতে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প রচনার রীতিমত সূত্রপাত। 'ভিখারীনি' গল্পটি ছাড়িয়া দিলে তার আগে তিনটি মাত্র গল্প তিনি লিখিয়াছেন,

নৌকায় রবীন্দ্রনাথ

১৩ শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ বিশী
১৪ পূর্বোক্ত

ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা ১৮৮৪ সালে, আর মকুট গল্পটি ১৮৮৫ সালে।"

প্রমথনাথ বিশী আবারও ঐ একই বইয়ে লিখেছেন যে, '১৮৯১ হইতে ১৮৯৫, (বাংলা ১২৯৮-১৩০২) এর মধ্যে পাইতেছি চুয়াল্লিশটি গল্প, সমগ্র গল্পগুচ্ছের অর্ধেকের কিছু বেশী, প্রায় প্রত্যেক মাসে একটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধনা পত্রিকার জন্য রচিত। এই কয়েক বছর সোনার তরী ও চিত্রা কাব্য রচনার সময়।'

'শিলাইদহে দীর্ঘকাল তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে যুক্ত ছিলাম, আজো তোমাদের মন থেকে তা' ছিন্ন হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তোমার চিঠিখানিতে। শ্রদ্ধার দান নানা স্থান থেকে পেয়েছি, তোমাদের অর্ঘ্য সকলের চেয়ে মনকে স্পর্শ করেছে।'

প্রমথনাথ বিশীর গবেষণায় তিনি লক্ষ্য করেছেন, ১৮৯৮ (বাংলা ১৩০৫) সালে কাহিনীমূলক কাব্যের বদলে গল্প বলার ধারাটা গদ্যের খাতে ফিরে গেছে এবং এই সময় আমরা সাতটি গল্প পাই। অতঃপর ১৯০০ (বাংলা ১৩০৭) সালে আটটি ছোট গল্প। ১৯০১ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে সবশুদ্ধ আটটি মাত্র গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। এই স্বল্পতার কারণ গল্পের টুকরোগুলো জমিয়ে এক জোটে উপন্যাস আকার লাভ করে। এই সময় তিনি তিনটি উপন্যাস রচনা করেন – চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা। ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে ছোট গল্পের বদলে আমাদের উপহার দিয়েছেন 'ঘরে বাইরে' এবং 'চতুরঙ্গ'।[১৫]

১৯১৭ সালে (বাংলা ১৩২৪) লিখেছেন তিনটি গল্প। এটা 'পলাতকা' কাব্যের সময়। পলাতকা কাব্যের প্রধান ভাবসূত্র নারী জীবনের মূল্য স্বীকার। এক সময়ে তিনি বলেছিলেন, 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ' - পলাতকা কাব্যে ঐ ভাবটিকেই যেন পূর্ণতা দান করলেন। বললেন মাতা, কন্যা ও বধূ রূপটিই নারীর সম্পূর্ণ রূপ নয়, নারী হিসাবেই তাদের নিজস্ব একটি মান আছে। পলাতকায় লিখেছেন -

আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জোৎস্না বীণায়
নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হতো সন্ধ্যা তারা ওঠা,
মিথ্যা হতো কাননে ফুল ফোটা।

এই সময়কার সামান্য পূর্ববর্তী বলাকা পর্বের গল্পগুলিতেও এই ভাবের ভাষ্যময় রূপ লক্ষ্য করা যায়।

রবিঠাকুরের লেখা নিয়ে একটা সমালোচনা আছে যে তিনি বাস্তববাদী নন, কল্পলোকে বিচরণ করেন এবং স্বরচিত মনোলোকে তাঁর ভ্রমণ ইত্যাদি। যারা এ সব বলেন তারা কবির জীবন পর্যালোচনা করলেই জানতে পারতেন তিনি তাঁর কাছে আসা মানুষকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন। গরীব-দুঃখী প্রজারা সামনে এলে ওদের দেখে তিনি ব্যথিত ও পীড়িত হয়েছেন এবং তখনই অন্তর দেবতার কাছে মনে মনে বলেছেন –

এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা,

এই সব শীর্ণ শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

রবীন্দ্র-পাঠক মাত্রই জানেন, কাব্য তাঁর অবসর বিনোদন বা স্বপ্নসুখ উপভোগ মাত্র ছিল না, জীবন সাধনার সূত্রে গ্রথিত ছিল। মানুষের প্রতি তাঁর গভীর আকুতি কখনও রূপ নিয়েছে কাব্যে, কখনও কর্ম-সাধনায়।

ঠাকুর পরিবারের জমিদারি ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাওয়ার পর শিলাইদহের সংগে কবির যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায় ১৯২২ সালে। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিলাইদহের স্মৃতি কবির মনের গভীরে নিভৃত যতনে ধ্বনিত হয়েছে এবং তাঁর মনকে আন্দোলিত করেছে। তা ভালভাবে লক্ষ্য করা যায় শেষ জীবনে লেখা 'ছেলেবেলায়', যেখানে তিনি শিলাইদহের উজ্জ্বল হৃদয়স্পর্শী বর্ণনার মাধ্যমে মনের উত্তাপ সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তিনি শেষবারের মত জমিদারির তৎকালীন মালিক তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে ১৯২৩ সালে শিলাইদহে আসেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও (১৯৩৮ সালে) শিলাইদহের একজনের চিঠির জবাবে লিখেছেন –

'শিলাইদহে দীর্ঘকাল তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে যুক্ত ছিলাম, আজো তোমাদের মন থেকে তা' ছিন্ন হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তোমার চিঠিখানিতে। শ্রদ্ধার দান নানা স্থান থেকে পেয়েছি, তোমাদের অর্ঘ্য সকলের চেয়ে মনকে স্পর্শ করেছে।'[১৬]

শিলাইদহে থাকাকালীন অনেক কবিতা ও সাহিত্য রচনার পাশাপাশি তিনি এ অঞ্চল থেকে আহরণ করে নিয়েছেন লেখার অনেক উপাদান যা পরবর্তীকালে এখান থেকে চলে যাওয়ার অনেক পরেও তাঁর সাহিত্য রচনার রসদ হিসাবে কাজে লেগেছে।

১৫ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, প্রমথনাথ বিশী, ভাদ্র ১৩৬১
১৬ সাহিত্যতীর্থ শিলাইদহে, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ, সম্পাদনা: অসীম রাহা ও সৈয়দ মুর্তাজা সিরাজ, বৈশাখ ১৩৭৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

তোতা-কাহিনী

১ এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত; জানিত না কায়দা-কানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

২ রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, 'উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী?'

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩ স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, 'শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।' কেহ বলে, 'শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল!'

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, 'অল্প পুঁথির কর্ম নয়।'

ভাগিনা তখন পুঁথি লিখকদের তলব করিলেন। তাহারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, 'সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না।'

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রইল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পর ঝাড়া মোছা পালিশ করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, 'উন্নতি হইতেছে।'

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠাবালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪ সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, 'খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।'

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের; ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।'

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫ শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাকঢোল কাড়া নাকাড়া তুরি ভেরি দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ কাণ্ডটা দেখিতেছেন!'

মহারাজ বলিলেন, 'আশ্চর্য! শব্দ কম নয়!'

ভাগিনা বলিল, 'শুধু শব্দ নয়; পিছনে অর্থও কম নাই।'

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন, এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, 'মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি?'

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, 'ওই যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।'

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, 'পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।'

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনে ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই - চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের কান যেন আচ্ছা করিয়া মলিয়া দেওয়া হয়।

৬ পাখিটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর মতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকাল বেলায় আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝটপট করে। এমন-কি, এক-একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, 'একি বেয়াদবি।'

তখন শিক্ষামহলের হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।'

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া, এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭ পাখিটা মরিল। কোনকালে যে, কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই।

নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, 'পাখি মরিয়াছে।'

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি!'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায়?'

ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম।'

'আর কি ওড়ে?'

'না।'

'আর কি গান গায়?'

'না।'

'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?'

'না।'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল।

রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্‌ গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

ভূগর্ভস্থ যাদুঘর, পাবলিক লাইব্রেরি ও চারুকলা ইনস্টিটিউট

আশরাফ আহমেদ

একদিন ঢাকার কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখতে একাই বেরিয়ে পড়লাম। গত বছর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে শিখা চিরন্তন-এর পাশে একটি ভূগর্ভস্থ স্বাধীনতা যাদুঘর খোলা হয়েছে বলে পত্রিকায় পড়েছিলাম। পরে আমার বন্ধু শাহ আলম মজুমদার সেটির অনেক প্রশংসা করে বলেছিলেন যেন সুযোগ পেলে তা দেখে আসি। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটের উল্টোদিকে উদ্যানের ভেতরে ঢুকলাম। বেশ কিছুটা পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলে প্রথমেই দেখা গেল শিখা চিরন্তন-এর শিখা। ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানের সেনাপতি যে জায়গায় বসে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাছে ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ করেছিল, শিখা চিরন্তনটি ঠিক সেই জায়গাতেই রাতদিন জ্বলে থেকে আমাদের ত্যাগ ও বিজয়কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে!

এটিকে পেছনে ফেলে দক্ষিণে একটি বিশাল ও প্রশস্ত ইট-সিমেন্ট বাঁধানো চত্বর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। চত্বরটির দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সারিবদ্ধ গাছের সমান্তরালে আরো দুটি লাইনে নতুন গাছ ও নীচু নীচু আলোর খুঁটি লাগানো আছে। দৃশ্যটি খুব ভাল লাগলো। আমি যখন পৌঁছালাম তখন সূর্যতাপ প্রখর হয়ে এসেছে। ফলে সময় নিয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করার ইচ্ছা হলেও বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না।

পায়ে হাঁটার এই চত্বরটি স্বাধীনতা যাদুঘরের নীচু সিঁড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গেলে পাহারারত পুলিশ জানালো এখন মেরামতের কাজ চলছে বলে যাদুঘরের মূল স্থাপনায় যাওয়া যাবে না। তারা আরো জানালো যে, মাটির নীচের যাদুঘরটিও আজ খোলা নেই। ফলে আমি এই দৃষ্টিনন্দন যাদুঘর চত্বরের ধার ঘেঁষে চারিদিকে হেঁটে দেখলাম। চত্বরের পূর্বদিকে অর্থাৎ রমনা পার্কের দিকে বাঁধানো অত্যন্ত সুন্দর, বাঁকানো একটি জলাশয় রয়েছে। ধারণা করা যায়, রৌদ্রের তেজে ভাটা পড়লে বা সন্ধ্যার মৃদু সমীরণে এবং পরিমিত আলোর পরিবেশে এই পায়ে হাঁটা বাঁধানো চত্বর, যাদুঘর এবং জলাশয়টি মিলে একটি চমৎকার আবহ সৃষ্টি করবে। কিন্তু সেই আবহ অনুভব করার ভাগ্য আমার নেই, অন্তত এই যাত্রায়।

বিশাল বিশাল অট্টালিকার আড়ালে ঢাকা পড়া আকাশের দৃশ্য এবং গাছগাছালির প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করার; এবং ঢাকার বুকে এতো সুন্দর একটি যাদুঘরের অস্তিত্ব সত্যিই একটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কিন্তু এই সবকিছুকেই ম্লান করে দিয়েছে ধুলা এবং চারিদিকে ছড়ানো ছিটানো আবর্জনা! তার ওপর জলাশয়ের পানিতে জন্মানো শেওলা পচে গিয়ে এক বোঁটকা দুর্গন্ধ বাতাসকে দূষিত করে দিচ্ছে! জলাশয়টির অপর তীর কয়েকটি ছিন্নমূল পরিবারের রান্নাঘর এবং কাপড় ধোয়ার প্রয়োজন মেটাচ্ছে। ফলে পরিবেশটির নান্দনিক সৌন্দর্যও ব্যাহত হচ্ছে।

পাবলিক লাইব্রেরি ভবনটি নতুন, এখন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নেই। এটি এখন সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের উল্টোদিকে, চারুকলা ইনস্টিটিউট এবং জাতীয় যাদুঘরের মাঝে ঠাঁই করে নিয়েছে। বই ও সাময়িকী রাখার দুটি তলায় ঘণ্টা দুয়েক কাটালাম। নীচের তলায় বিজ্ঞান বিষয়ক তাকগুলোয় যুলজি, বোটানি, মাইক্রোবায়োলজি, ও

বায়োকেমিস্ট্রির প্রায় সব কটি বই খুলে খুলে দেখলাম। প্রায় দশ বছরের পুরনো দুয়েকটি মাইক্রোবায়োলজি-বায়োটেকনোলোজি জাতীয় বইয়ের ব্যতিক্রম ছাড়া কোনটিই আধুনিক নয়। বেশির ভাগের সংস্করণই কুড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো। আমি জানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর কোন বইই পড়ানো হয় না, কারণ এ যুগে বইগুলো নেহাতই অচল! তাহলে পাবলিক লাইব্রেরি কেন তাদের তাকগুলো এসব বই দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে?

বিভিন্ন সাময়িকী ও দৈনিক খবরের কাগজ আছে ওপর তলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে প্রশ্রাবের উৎকট গন্ধে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে আসার জোগাড় হলো! সেটি সহ্য করে বাঁয়ে এগিয়ে গেলাম। এখানে সারি বাঁধা অনেকগুলো চেয়ার-টেবিলকে ঘিরে আছে চারপাশে সাজানো বইয়ের তাক। চেয়ারগুলোর প্রায় সবকটিই দখল হয়ে আছে, আর মনে হলো সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে ও লিখছে। দৃশ্যটি দেখে খুব ভাল লাগলো যে, আমাদের লোকজন শুধু হরতাল-স্লোগানের মাঝেই তাঁদের সময় কাটান না। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কিত অনেকগুলো বই থেকে দুটিতে চোখ বুলানোর ইচ্ছা হলো।

একটি টেবিলে বেশ কটি চেয়ার খালি দেখে বসতে গেলে 'মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত'-জাতীয় একটি লেখা দেখে অন্যত্র বসলাম। লক্ষ্য করলাম সংরক্ষিত আসনে শুধু একজন মহিলাই বসে আছেন অথচ সারা ঘরে দখল করে রাখা সবগুলো চেয়ারে পুরুষদের মাঝে মাঝে প্রায় সমান সংখ্যক মহিলাও মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছেন। আরো দেখলাম এখানকার পাঠকদের মাঝে প্রায় সবাই-ই যুবা বয়েসি এবং প্রত্যেকের সাথে একটি বইয়ের ব্যাগ আছে। তিরিশ বছরের বেশি একটি চেহারাও নজরে পড়লো না। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এদের প্রায় সবাই ছাত্র, সম্ভবত পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরীক্ষায় পাশ করে যাদের ডিগ্রী পাওয়া হয়ে গেছে, আর তাদের পড়াশোনার প্রয়োজন নেই বলেই হয়তো এখানে বয়স্কদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তারপরও মনে হলো, অতি দ্রুত বদলে যেতে থাকা বাংলাদেশের ছাত্ররা অন্তত পড়াশোনা করে পাশ করার সনাতন রীতিটা আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে। এটি একটি শুভ লক্ষণ।

পাবলিক লাইব্রেরি চত্বরে কিছুটা নিরিবিলি পরিবেশে 'অন্যপ্রকাশ' প্রকাশনা সংস্থার পুস্তক বিক্রয় ও প্রদর্শনী চলছিল। বেশ বড় দোকানটিতে ক্রেতাদের হাতের নাগালের দুই সারির সবগুলো বই-ই ছিল হুমায়ূন আহমেদের। হুমায়ূন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক ক্লাশ ওপরে ছিলেন। পরে শিক্ষকতা করার সময় শিক্ষকদের ক্লাবে অনেক সন্ধ্যা চায়ের টেবিলে বসে আলাপ করে কাটিয়েছি। তার বইয়ের পরের সারিতে অন্যান্য লেখকের বইয়ের মাঝে মুহাম্মদ জাফর ইকবালের কল্প-বিজ্ঞানের বইগুলো সহজেই নজরে পড়লো। জাফর ইকবাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক ক্লাশ নীচে এবং একই ফজলুল হক হলের ছাত্র ছিলেন বলে পরিচয় ছিল। পরে ১৯৯৫ সনে নিউজার্সিতে 'ফোবানা' বাংলাদেশ সম্মেলনে শেষ দেখা হয়েছিল। এই দুজনই আমার প্রিয় ব্যক্তি, তাঁদের অনেক বই পড়েছি বলে তাঁদের লেখার বিষয় ও স্টাইলের সাথেও আমি পরিচিত। বাংলাদেশে বিশেষ করে উঠতি বয়সের এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই দুজনই দারুণ প্রিয় লেখক। একটু আগে লাইব্রেরির ভেতরে দেখা পড়াশোনায় ব্যস্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং লাইব্রেরির বাইরে বইয়ের দোকানে দুই বিশেষ লেখকের বইয়ের সমাহারের মাঝে হঠাৎ করেই যেন একটা যোগসূত্র আছে মনে হলো।

পাবলিক লাইব্রেরির পাশেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট। বেশ কবছর থেকে ঢাকায় পহেলা বৈশাখের সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় মিছিল ও অনুষ্ঠান হয়। তাতে বিভিন্ন প্রাণী ও লোকজ শিল্পের নানান ঝলমলে রঙের মুখোস, ফেস্টুন, পোস্টার ইত্যাদি বানিয়ে ও আলপনা এঁকে এই ইনস্টিটিউটটি জনসাধারণ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছে। এবার ঢাকা ভ্রমণের তালিকার মাঝে এখানে আসাও ঠিক করে রেখেছিলাম। ভেতরে ঢুকতে মনে হলো এখন কোন প্রদর্শনী চলছে। বিল্ডিংটির বাঁকানো বারান্দার দেয়ালে সারি বেঁধে শিল্পীর নাম সহ অনেক পেইন্টিং সাঁটা। মাঝে মাঝে খোলা ক্লাশরুম ও স্টুডিওগুলোতে দুয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন শিল্প নির্মাণে ব্যস্ত।

এখানেও আনাগোনারত প্রায় সবাইই ছাত্র-ছাত্রী মনে হলো এবং সম্ভবত আমার সামনের পেইন্টিংগুলোরই শিল্পী। এদের প্রায় সবার হাতেই একটি করে ক্যামেরা এবং পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দেখে সহজেই ধরে নেয়া যায় এরা সমাজের উচ্চবিত্তের সন্তান। চিত্রগুলোর একটি একটি করে আমি দেখে যাচ্ছিলাম। বিষয় ও রঙের সমাহার চমৎকার হলেও বারান্দায় ধুলার স্তূপ ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাগজের টুকরা, গাছের পাতা, খাবারের মোড়ক নিয়ে যে পরিবেশ ছিল তা আমার কাছে চিত্রগুলোর শিল্প-মর্যাদা প্রকাশ করতে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম দুজন মাঝবয়েসি ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। তা দেখে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় সবাই তাঁদের চারপাশে এসে 'স্যার স্যার' বলে গোল করে দাঁড়ালো। শিক্ষকরাও কয়েকটি চিত্রকর্মের ওপর তাঁদের বিজ্ঞ মতামত দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গেলেন।

বারান্দার নীচে মাটির চত্বরে বাগানের মাঝে অনেকগুলো স্থায়ী মূর্তি দেখতে পেলাম। একসময়ে যত্ন করে বানানো

হলেও পরিচর্যার অভাবে সেগুলোকে অবহেলার বস্তু মনে হচ্ছিল। এসবের বাইরে অস্থায়ী কিছু মডার্ন আর্টের মূর্তি। বিশাল দুটি পোস্টারে বিভিন্ন নারী শিল্পীর পরিচিতি এবং অবদানের কথা লেখা ছিল। লেখাগুলো পড়তে গেলে শিল্পী ও দর্শকদের পায়ের নীচে মৃতপ্রায় ঘাসগুলো খাদ্য ও পানির অভাবে আর্তনাদ করছিল বলে আমার মনে হলো। এখানে মনুষ্য-সৃষ্ট আবর্জনা বারান্দা থেকেও বেশি। তার ওপর কয়েক হাত পরপর গাছের শুকনো পাতা জড়ো করে বা কাগজ পোড়ানো ছাই ছড়িয়ে থেকে দৃশ্যটিকে আমার কাছে অসহনীয় করে তুলছিল।

আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, এই পরিবেশ কি এখানকার শিল্পীদের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি, না এখানে চাকর নেই বলে ধনীর দুলালদের সৃষ্ট আবর্জনার স্তূপ। কারণ যাই হোক, পুরো পরিবেশটি শিল্প-কর্মগুলোর আবেদন ম্লান করে দিয়েছে বলে আমার মনে হলো। অথচ আসাদুজ্জামান নূরের 'জুয়েল অফ বেঙ্গল' নামে ইংরেজি সাবটাইটেলে একটি বাংলা নাটকে কদিন আগে দেখা ঠিক এই বাগান ও মূর্তির দৃশ্যগুলো কি জীবন্ত দেখাচ্ছিল!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমার আক্ষরিক লেনদেন শেষ হয়েছে সেই বত্রিশ বছর আগে। চারুকলা ইনস্টিটিউটটি তার আগেই প্রতিষ্ঠিত হলেও গ্যালারিতে একটি আর্ট এক্সিবিশন দেখা ছাড়া এখানে আর আসা হয়নি। আজ দালানের বাঁকানো বারান্দা ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর দিকে এগিয়ে গেলাম। বাঁকানো বারান্দার পর দুপাশে ক্লাশরুম সহ আরেকটি লম্বা বারান্দামত জায়গা শেষ হলে সামনে পেলাম একটি বিশাল এবং গভীর পুকুর। অথচ পুকুরটির ভেতরে কোন পানি নেই! পুকুরটির আকৃতি অনেকটা গামলার মত, আর মনে হলো আগাছার মাঝেও একেবারে নীচে নেমে যাওয়ার জন্য পায়ে হাঁটার মত একটি পথ মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে। ওপর থেকে পুকুরটির নীচ পর্যন্ত পুরোটি দেখা যায় বলে কিছুক্ষণ আগে ইনস্টিটিউট চত্বরে দেখা মানুষ-সৃষ্ট আবর্জনার প্রতিচ্ছবিটি এখানে অনেক বেশি প্রকটভাবে চোখে পড়ে। পুকুরের পাড় এবং ধার ঘেঁষে অনেক গাছ ও আগাছা জন্মালেও এটি একেবারে শুকনো ও প্রায় নিখুঁত গোলাকৃতি বলে কোন বিশেষ প্রয়োজনে বানানো হয়েছে বলে ধারণা হতে পারে।

এসব যখন ভাবছিলাম, তখন পুকুর পাড় ধরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলানো এক যুবককে এগিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম। এ ইনস্টিটিউটেরই সেই ছাত্রটি অতিশয় বিনয় ও সম্মানের সাথে জানালো, 'পুকুরটি অবশ্যই একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে। সামনের এই পুকুর, দাঁড়িয়ে থাকা এই বারান্দা, তারপর ঐ বাঁকানো বারান্দা সব মিলে আপনি একটি একতারা হিসেবে কল্পনা করতে পারেন। সত্যি বলতে কি, আকাশ থেকে দেখলে এই স্থাপনাগুলো একত্রে একটি একতারার মতোই দেখায়। পুকুরটি একতারার খোল, লম্বা বারান্দাটি একতারার দেহ, আর বাঁকানো বারান্দাটি একতারার মাথা যেখানে তারটি বাঁধা থাকে।' একটু থেমে যুবক আরো বললো, 'পুকুরের মাঝে মঞ্চ বানিয়ে নাটকও মঞ্চস্থ হয় যখন আবহাওয়া ভাল থাকে।' এবার আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে এসে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে আগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ব্যস্ত দেখেছি। জীবনের মান উন্নত করতে আপনার জন্য ব্যয় করার মত সময় কারো হাতে নেই। এই অবস্থায় যুবকের এগিয়ে আসা আমাকে অভিভূত করেছিল, কিছুটা কৃতজ্ঞতাও বোধ করেছিলাম।

কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো সেই যুবক বিজ্ঞের ও বিনয়ের আচরণে একতারার খোল হিসেবে পুকুরটির এই ব্যাখ্যা দিয়ে সহজেই আমার ঔৎসুক্যের একটি সন্তোষজনক জবাব দিয়েছিল। তাৎক্ষণিক বিশ্বাস করা মানুষের কিছু কথাকে আর সত্য বলে ভরসা পাই না বলে আমেরিকায় ফিরে ইন্টারনেট ও গুগুল আর্থ খুঁজে দেখলাম। যদিও ইনস্টিটিউটটিকে স্থপতি মাজহারুল ইসলামের অসামান্য (মাস্টারপিস) কীর্তি আখ্যা দেয়া হয়েছে, কিন্তু যুবকের এই ব্যাখ্যার কোন সত্যতা আমি দেখতে পেলাম না! ইনস্টিটিউট জন্মের বহু আগে, ঐতিহাসিক সময় থেকেই পুকুরটির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু বিল্ডিংগুলো বানানোর সময় এর অবস্থিতি পুরো চত্বরের নান্দনিক সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেবে, স্থপতির মাথায় সে চিন্তাটি ছিল।

কিছু কিছু লোক অতি স্বাভাবিকভাবে বানিয়ে গল্প বলে খুব সহজেই মানুষের বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে। হতে পারে একতারার বর্ণনা দেয়া সেই যুবক তাদেরই এক প্রতিনিধি। তাৎক্ষণিক সফলতায় সে নিশ্চয়ই অনেক আত্মতৃপ্তিও লাভ করেছিল। কথার শিল্পী হিসেবে সে নিশ্চিতভাবে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী! আবার শিল্পী হিসেবে আসলেই হয়তো সে তার মানসচক্ষে পুরো স্থাপনাটিকে একতারা হিসেবেই দেখতে পেয়েছিল, সাধারণ জনগণের চোখে যা কোনদিনই ধরা পড়ে না।

১ জুন ২০১২

লেখক আমেরিকা-প্রবাসী বাংলাদেশের প্রাণরসায়ন বিজ্ঞানী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, বর্তমানে আমেরিকার একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে গবেষণার কাজ করছেন।

বিশ্ব ক্রিকেটে টাইগাররা

মো: জাহিদুল ইসলাম

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টাইগারদের জয় (উপরে) এবং পাকিস্তানকে বাংলাওয়াশ (নিচে)

ক্রিকেট বিশ্বকাপের ইতিহাসের পাতায় লেখা কতো ক্রিকেট-বীরের কাব্য। যার ব্যতিক্রম হয়নি এবারের বিশ্বকাপেও। বিশ্বকাপের মঞ্চে এবারই প্রথম ক্রিকেটপ্রেমীরা উপভোগ করলো ডাবল সেঞ্চুরি। তাও আবার দুটি ডাবল সেঞ্চুরি - ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইলের (১৪৭ বলে ২১৫ রান) আর নিউজিল্যান্ডের মার্টিন গাপটিলের (১৬৩ বলে ২৩৭ রান, অপরাজিত) ব্যাট থেকে। আর একটি কাব্য রচনা করলেন শ্রীলংকার অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান কুমারা সাঙ্গাকারা পরপর চার ম্যাচে চারটি সেঞ্চুরি করে। ইতিহাসের পাতায় আরও লেখা থাকবে ইংল্যান্ডের স্টিভেন ফিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জে পি ডুমিনির নাম, তাদের হ্যাটট্রিকের জন্য।

বিশ্বকাপের মঞ্চে মহাকাব্য লিখতে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। যার প্রমাণ বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ব্যাটে পরপর দুই ম্যাচে দুটি শতক – যা এর আগে করেছেন মাত্র সাতজন ব্যাটসম্যান। ছয় ম্যাচে তার রান দাঁড়ায় ৩৬৫ – যা বাংলাদেশী ব্যাটসম্যানের পক্ষে সর্বোচ্চ। আর ক্রিকেটবিশ্ব দীর্ঘদিন স্মরণ করবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে উত্তেজনাকর ম্যাচে বাংলাদেশের পেসার রুবেল হোসেনের পরপর দুই বলে দুই ইউকেট নিয়ে ম্যাচ জেতার স্মরণীয় মুহূর্ত।

মাশরাফি বিন মুর্তজার দলের বিশ্বকাপ মিশন শুরু হয় আফগানিস্তানের সাথে খেলে। বাংলাদেশ দাপটের সাথে খেলে জয় তুলে নেয় ১০৫ রানের বড় ব্যবধানে। এরপর স্কটল্যান্ডের সাথে টাইগার বাহিনী ৩১৯ রানের টার্গেট তাড়া করে জয় তুলে নেয় ৬ উইকেটে। বিশ্বকাপে এর আগে ৩০০ রানের বেশি তাড়া করে জেতার রেকর্ড ছিল তিনটি দলের (শ্রীলংকা, ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড)। ১৬ কোটি বাঙালির স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ইংল্যান্ড। সমীকরণ দাঁড়ায় বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড ম্যাচটি জিতলে বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে স্বপ্নের কোয়ার্টার ফাইনালে। সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে অ্যাডিলেডে সেদিন শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে ইংলিশদের ১৫ রানে হারিয়ে স্বপ্ন পূরণ হলো বাংলাদেশের। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোয়ার্টার ফাইনালে বাজে আম্পয়ারিংয়ের শিকার হয়ে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ হারে ১০৯ রানে।

নিউজিল্যান্ড-শ্রীলংকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়ে দীর্ঘ দেড় মাস ক্রিকেটপ্রেমীদের হাসিয়ে-কাঁদিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালের মঞ্চে নিউজিল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার শিরোপা পুনরুদ্ধারের মধ্যদিয়ে বিশ্বকাপের পর্দা নামে। আগামী ৪ বছর আবার বিশ্বক্রিকেট শাসন করবে অস্ট্রেলিয়া।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের বড় অর্জন তাদের আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাসকে ধারণ করেই বিশ্বকাপ পরবর্তী হোম সিরিজ শুরু করে ক্রিকেট পরাশক্তি পাকিস্তানের সাথে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিটি ম্যাচে ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং সকল ক্ষেত্রেই দুর্দান্ত খেলে ১৬ বছর পর পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ জয়ের স্বাদ পায়। শুধু তাই নয় ওয়ানডে সিরিজে ৩-০ তে পাকিস্তানকে করা হয় বাংলাওয়াশ। এরপর ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত এবং বিনোদনমূলক ফরমেট টি-টুয়েন্টি ক্রিকেটেও একমাত্র ম্যাচে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশ জয় তুলে নেয়। টাইগার বাহিনী অর্জিত আত্মবিশ্বাস বুকে ধারণ করে টেস্ট সিরিজেও ভালো করবে, আশাবাদ বাঙালিদের। তামিম, সাকিব, মাহমুদুল্লাহ, মুশফিক, মাশরাফি, রুবেলদের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের পাশাপাশি নবীন খেলোয়াড় সৌম্য, সাব্বির, তাসকিন, সানি, মুস্তাফিজদের চোখ ধাঁধানো পারফরমেন্স বাংলাদেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আরো অনেক দূর।

লেখক : এক্সিকিউটিভ অফিসার, সিদীপ, প্রধান কার্যালয়।

শিশুদের ভালভাবে পড়ানোর কৌশল আমার অভিজ্ঞতা

পলি আক্তার

আজকের শিশুরাই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তাই আমাদের উচিত তাদের প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে সাহায্য করা। কেননা আমরা যেভাবে বীজ বপন করব, ভবিষ্যতে সেই অনুসারে ফল ধরবে। শিশুদের মন নরম কাদামাটির মত। তাই তাদেরকে আদর, স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী করে তুলতে হবে। আর শিশুদের মনোযোগের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন কৌশল।

ভাল ব্যবহার: শিশুদেরকে যদি ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে শিখানো যায়, ঐ শিশুরা শিক্ষাগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। ধমক দিয়ে, শাসন করে তা পারা যায় না। তাই শিশুদের পাঠে মনোযোগী করার প্রথম কৌশল হচ্ছে ভাল ব্যবহার।

কুশল বিনিময়: শিক্ষিকা ক্লাসে ঢুকে ছাত্রছাত্রীর নাম জানবেন। প্রয়োজনে ১/২ জন ছাত্রছাত্রীর খুব নিকটে গিয়ে আদর দিয়ে মিষ্টি ভাষায় মাতৃস্নেহে কুশলাদি জিজ্ঞেস করবেন। এতে শিশুরা পাঠে আগ্রহী হয়।

নিরাপদ-আনন্দদায়ক পরিবেশ: শিশুদের পাঠে মনোযোগী করার জন্য নিরাপদ পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার শিশুদেরকে সব সময় আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষাদান করালে তাদের মনের বিকাশ হয়।

আবেগ সৃষ্টি: লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিনোদন যেমন, নাচ, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি যেকোন একটি অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে ক্লাসে মনোযোগী করা যায়।

কৌতূহল জাগানো: একেক শিশু একেক রকম। তারা নতুন কিছু জানতে চায়। বিভিন্ন গল্প, নাটক, কৌতুকের মাধ্যমে তাদেরকে কৌতূহলী করা উচিত।

বন্ধুসুলভ আচরণ: যদি শিক্ষক ছাত্রদের পাশে এসে বন্ধু হয়ে লেখাপড়া শিখায় তবে শিশুটি তার লেখাপড়ায় মনোযোগী হবে এবং সঠিক শিক্ষালাভ করতে সমর্থ হবে।

শ্রেণিবিন্যাস: শিক্ষকের কর্তব্য তার ছাত্রছাত্রীকে দায়িত্ব, নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা শিখানো। ছাত্রছাত্রীরা এলোমেলো বসে থাকতে পারে। শিক্ষিকা সকল ছাত্রছাত্রীকে শ্রেণিভিত্তিক বসিয়ে দিবেন। এতে পরিবেশ সুন্দর থাকবে ও মনোযোগ সৃষ্টি হবে।

বর্ণ শিখানোর কৌশল: শিক্ষিকা আজকের পাঠের বর্ণটি বোর্ডের মাঝখানে লিখবেন এবং ধীরে ধীরে নির্দেশনা দিবেন। দুইপাশ থেকে দুজন শিক্ষার্থী এসে বোর্ডের লেখা বর্ণটির উপর হাত ঘুরাবে এবং পাশে লিখবে। এরপর যার যার খাতায় অনুশীলন করবে। শিশু শ্রেণির ক্ষেত্রে বর্ণ চেনার জন্য প্রত্যেক শিক্ষিকা পুরাতন ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করে অপর পাতায় সাইন পেন দিয়ে বর্ণগুলো লিখে নিয়ে আসবেন।

বানান শিখানোর কৌশল: শিক্ষিকা যে শব্দটির বানান শিখাবেন তা বোর্ডের বাম পাশে উপরে লিখবেন। তিনি ২/৩ বার শুদ্ধ উচ্চারণ করে শুনাবেন। শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে পড়বে। শব্দটি বানান করে শিক্ষিকা ৫/৬ বার পড়বেন ও শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে পড়বে। যুক্তাক্ষর হলে কোন কোন বর্ণ মিলে যুক্তাক্ষর হয়েছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। যেমন – ক + ষ + ট = কষ্ট।

কবিতা-গল্প পড়ানোর কৌশল: প্রথমে কবিতা ও কবির নাম বোর্ডে লিখে উচ্চারণ, বানান, অর্থ ও লেখা শিখাতে হবে। তারপর কবিতার অর্থ বুঝিয়ে বলতে হবে। জটিল শব্দের অর্থ বলতে হবে। শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদেরকে গ্রুপ আকারে বসিয়ে কবিতা পড়াবেন এবং লিখাবেন। একইভাবে গল্প পড়াবেন এবং বাচ্চাদেরকে ভাল করে বুঝাবেন।

নামতা শিখানোর কৌশল: শিক্ষিকা বোর্ডের বামপাশে নামতার চার্ট ঝুলাবেন। তিনি ১/২ বার সুর করে পড়বেন ও শিক্ষার্থীরা শুনবে। এরপর শিক্ষিকার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা পড়বে।

অংক শিখানোর কৌশল: যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি শিখাতে হলে প্রথমে বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে শিখাতে হবে। যেমন বিচি, আপেল, মাটি ইত্যাদি উপকরণের মাধ্যমে শিখানো যায়। এরপর অর্ধবাস্তবের মাধ্যমে শিখাতে হবে, যেমন বোর্ডে ছবি এঁকে। পরিশেষে সংখ্যা প্রতীকের সাহায্যে শিখাতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, একটা শিশুর ভাল লেখাপড়ার জন্য কৌশলের ভূমিকা অপরিসীম।

লেখক ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কুটি অঞ্চলের সাহেবাবাদ শাখায় একটি সিদীপ শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকা। তিনি রচনা-প্রতিযোগিতা ২০১৩-এ বিজয়ীদের একজন।

ক্ষুদ্রঋণে খেলাপি না হওয়ার উপায় ও করণীয়

মোঃ সাইফুল ইসলাম

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের অনেক মানুষ দরিদ্র। দরিদ্র মানুষের কাছে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় একটি কঠিন কাজ। আর এ কঠিন বাস্তবতার সাথে মোকাবিলা করতে হয় আমাদের প্রতিনিয়ত। এ কঠিন কাজটা তখনি সহজ হয় যখন একজন ভাল সদস্য ও ঋণী নির্বাচন করা যায়। ক্ষুদ্রঋণের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। এই দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সিদীপ নব্বই দশকের শেষের দিকে কার্যক্রম শুরু করে অদ্যাবধি ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে।

ক্ষুদ্রঋণে খেলাপি না হওয়ার উপায়: ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সঠিক সদস্য নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক সদস্য ও ঋণী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। সঠিক ঋণী সদস্য নির্বাচনে ব্যর্থ হলে সমিতি পর্যায়ে দেখা দেয় নানা সমস্যা। আর এ সমস্যা থেকে সৃষ্টি হয় ঋণ খেলাপি। ঋণ খেলাপি থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পূর্বে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। নিম্নে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. স্বাক্ষর জানে এমন সদস্যকে ঋণী নির্বাচন করতে হবে।

২. সদস্যর স্বামীর স্বাক্ষর নিশ্চিত করে ঋণ দিতে হবে। স্বামী বিদেশে থাকলে তার উপযুক্ত অভিভাবক, যেমন শ্বশুর-শাশুড়ি, ভাসুর-দেবর অথবা নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের স্বাক্ষর নিশ্চিত করা এবং তাদের সাথে ভালভাবে আলোচনা করে ঋণ প্রদান করা।

৩. সদস্যর নাম, স্বামীর নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা এবং সকল তথ্য আইডি কার্ডের সাথে মিল আছে কিনা তা দেখে নেওয়া ও আইডি কার্ডের ফটোকপি ঋণ আবেদন ফরমের সাথে সংযুক্ত করা।

৪. সরেজমিনে সদস্যর প্রকল্প যাচাই করা এবং উক্ত প্রকল্প তার নিজের কিনা তা পার্শ্ববর্তী লোকের কাছ থেকে জেনে নেওয়া।

৫. একাধিক সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে এবং এলাকায় অনেক ঋণগ্রস্ত কিংবা তার আর্থিক অবস্থা ভাল না এমন সদস্যকে ঋণ দেওয়া যাবে না।

৬. অনেক সদস্যর স্বামীর সাথে কথা বলতে চাইলে সদস্য বলে আমার স্বামী এসব কিস্তি পছন্দ করে না, আমার কিস্তি আমি দিব, স্বামীকে জানানোর প্রয়োজন নাই। এসব সদস্যকে ঋণ দিলে ঋণ খেলাপি হতে পারে।

৭. কিছু কিছু সদস্য আছে ঋণ গ্রহণ করে অন্যকে ঋণের টাকা দিয়ে দেয়। পরবর্তীতে এসব ঋণের কিস্তি খেলাপি দেখা দেয়। তাই এসব সদস্যকে ঋণ দেওয়া যাবে না।

৮. কিছু কিছু মহিলা বাবার বাড়ি আসে বেড়ানোর জন্য। বাবার বাড়ি ১-২ মাস থাকে। সে সমিতিতে ভর্তি হয় এবং সমিতির অন্য সদস্যরা বলে সে এখন বাবার বাড়ি থাকে, তাকে ঋণ দেওয়া যাবে, তার কিস্তি সমস্যা হবে না। ঐসব সদস্যকে ঋণ দিলে দেখা যায় ঋণ গ্রহণের পর সে স্বামীর বাড়ি চলে যায়। পরে সমিতিতে ঋণ খেলাপি দেখা দেয় এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাই বাবার বাড়ি থাকে এমন সদস্য ভর্তি ও ঋণ দেওয়া যাবে না।

৯. ঋণ দেওয়ার পূর্বে ঋণের শর্তসমূহ ও ঋণ পরিশোধের নিয়মাবলী সম্পর্কে সদস্যকে অবহিত করা এবং ভালভাবে আলোচনা করে ঋণ দেওয়া।

১০. ঋণ দেওয়ার পূর্বে তৃতীয় ব্যক্তির স্বাক্ষর নিশ্চিত করা। অনেক সময় দেখা যায় একজন সদস্য ঋণ প্রস্তাব করবে, অন্য একজন সদস্যর স্বামী অথবা ছেলে সমিতিতে কিস্তি নিয়ে এসেছে। আমরা তাকে বলি, ভাই, এখানে একটা স্বাক্ষর দিন; কিন্তু কি জন্য স্বাক্ষর নিলাম তা বলি না। তৃতীয় ব্যক্তির স্বাক্ষর নেওয়ার পূর্বে তার সাথে আলোচনা করি যে ভাই আপনি ঐ ব্যক্তির ঋণ ফরমে স্বাক্ষর দিচ্ছেন,

যদি ঐ সদস্য ঋণের কিস্তি পরিশোধে সমস্যা করে অথবা টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় তাহলে আপনার সমস্ত টাকা পরিশোধ করতে হবে। এভাবে আলোচনা করে ঋণ প্রদান করলে ঋণ খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

১১. সমিতিতে সকল সদস্যর উপস্থিতিতে সকল সদস্যর সাথে আলোচনা করে সকল সদস্যর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঋণ ফরম করতে হবে।

১২. নেশাগ্রস্ত, জুয়ারি, সুদের ব্যবসা করে এমন ব্যক্তিকে ঋণ দিলে ঋণ খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এমন ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া যাবে না।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সঠিক সদস্য নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক সদস্য ও ঋণী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। সঠিক ঋণী সদস্য নির্বাচনে ব্যর্থ হলে সমিতি পর্যায়ে দেখা দেয় নানা সমস্যা।

---

১৩. সমিতির নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী এবং সমিতির প্রতি অমনোযোগী সদস্যকে চিহ্নিত করে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমিতি থেকে বাদ দিতে হবে।

১৪. সমিতিতে স্বজনপ্রীতি করে ঋণের অযোগ্য ব্যক্তি অথবা চাহিদার অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করলে ঋণ খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই স্বজনপ্রীতি করে অযোগ্য ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া যাবে না।

১৫. ঋণ গ্রহণের পূর্বে সদস্য এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তা জেনে নেওয়া।

১৬. যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া। অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা সমিতি পরিচালনা না করা।

১৭. সঠিক সময়ে সমিতিতে যাওয়া এবং দলভিত্তিক কালেকশন করা।

১৮. সদস্যদের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে। আমাদের আচরণে কঠোর না হয়ে নিয়মে কঠোর হতে হবে।

১৯. জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে ঋণ প্রদান না করা।

২০. রাজনৈতিক দলের নেতা, মেম্বার, চেয়ারম্যান ও এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঋণের আওতায় আনা যাবে না।

২১. ঋণ গ্রহীতার আয়ের উৎস জেনে নেওয়া।

২২. দুশ্চরিত্র, অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত, বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ঋণের আওতায় না আনা।

খেলাপি প্রতিরোধে করণীয়: খেলাপি পড়া শুরু করলে সমস্ত কর্মকাণ্ডে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। খেলাপি প্রতিরোধে করণীয় বিষয় সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. খেলাপি পড়ার সাথে সাথে সমিতিতে যাওয়া ও খেলাপি পড়ার কারণ অনুসন্ধান করা।

২. শাখার সকল কর্মীদের নিয়ে সমিতির ভাল সদস্যদের সার্বিক সহায়তায় দলীয় চাপ প্রয়োগ করা।

৩. খেলাপি সদস্যর বাড়িতে কঠোরভাবে অবস্থান নেওয়া।

৪. সব সময় খেলাপি সদস্যর সাথে যোগাযোগ রাখা।

৫. খেলাপি সদস্যর কাছ থেকে এককালীন সমস্ত টাকা আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

৬. খেলাপি সদস্যর ফরমে স্বাক্ষর দেওয়া ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা এবং প্রয়োজনে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করা।

৭. পলাতক সদস্যের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করে তার অবস্থান নিশ্চিত করা।

৮. এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সমিতির সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা।

৯. খেলাপি সদস্যর সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করে বকেয়া টাকা আদায় করা।

১০. ঋণ খেলাপি সদস্যর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করা।

১১. শাখার সকলকে নিয়ে টিমওয়ার্ক করে চাপ প্রয়োগ করা এবং কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

১২. খেলাপি আদায়ের মূল উপায় হলো অবস্থান করা। সদস্যর বাড়িতে কঠিন অবস্থানের মাধ্যমে খেলাপি আদায় সম্ভব।

পরিশেষে বলতে চাই ঋণী যাচাই প্রক্রিয়ায় সাহিত্যনির্ভর কোন নিয়ম নেই। মূল কথা হলো ভাল সদস্য খুঁজে বের করা। ভাল সদস্য খুঁজে বের করতে পারলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ঝুঁকিতে পড়বে না। আমরা মেধা, জ্ঞান, বিবেক দিয়ে সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করেই ঋণী সদস্য নির্বাচন করবো। সদস্য নির্বাচনে আমরা বিন্দুমাত্র অবহেলা করব না। ১০০% যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সঠিক সদস্য নির্বাচনে আমরা বদ্ধপরিকর।

লেখক সিদীপের ফিল্ড অফিসার, দক্ষিণ বাঙ্গুরা শাখা, কুমিল্লা। এখানে প্রকাশিত মত লেখকের নিজস্ব।

শিশু শিক্ষা, নারীর ভূমিকা এবং উন্নয়ন

মোঃ তারিকুল ইসলাম

উন্নয়ন বলতে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষার উন্নয়ন বোঝানো হয়েছে। শিক্ষার উন্নয়ন, নারীর উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষিকাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ শিশুর সুশিক্ষার ভিত রচনার দায়িত্ব নারী যতটা যত্ন সহকারে পালন করতে পারে পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব না। সৃজনশীলতা বিকাশের শর্ত হচ্ছে শিশুর প্রতি যত্ন, ভালবাসা, আদর-স্নেহ, মায়া-মমতা ইত্যাদি। একটি শিশু যখন একে একে পাঁচ বছর তার শিক্ষা জীবনের শুরুর সময়টাতে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অনুশীলনের পাশাপাশি আনন্দদায়ক পরিবেশে পড়ালেখা শিখার সুযোগ পাবে তখন সে শিশুর মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে।

শিশুদের পরস্পরকে কিভাবে আপন করে নিতে হয় তা ভালভাবে শিখাতে হবে। এক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু ইত্যাদি বৈষম্যকে দূরে ঠেলে দিতে হবে। তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভিন্ন মনমানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠতে সক্ষম হবে। এভাবেই 'মানুষ মানুষের জন্যে' মনোভাবসম্পন্ন মানুষ গড়ে উঠবে। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে শিশু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে শিখবে। যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি ও শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্ব এসব মনোভাব এখন খুব প্রয়োজন। জাতিগত বিভেদ, ধর্মীয় বিভেদ, বর্ণ-বিভেদ, ধনী-দরিদ্রের বিভেদ ইত্যাদি সমাজ থেকে দূর করতে হলে আগামী প্রজন্মকে নতুনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর তাই প্রয়োজন দেশে দেশে শিশু শিক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট কারিকুলামের মধ্যে এনে তার মধ্যে নতুন মূল্যবোধ, মানবতাবোধ, নৈতিকতাবোধ, ভালমন্দের বিচার-বুদ্ধি ইত্যাদি জাগ্রত করে তুলতে হবে।

এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী একটি ইউনিফর্ম শিশু শিক্ষার কারিকুলাম তৈরি এবং সেটার প্রবর্তন আবশ্যক। যে কারিকুলাম আগামী প্রজন্মকে একটি উন্নত নৈতিক চেতনায় গড়ে তুলবে। সেই কারিকুলামে মানবতাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষ যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক না কেন, যে ভাষায় কথা বলুক না কেন, যে জাতির ও বর্ণের হোক না কেন, শিশু শিক্ষার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সকল দেশ একই কারিকুলাম অনুসরণ করতে পারে কিনা ভেবে দেখতে হবে। এভাবে পৃথিবীর সকল শিশুকে একটি আদর্শ শিক্ষার মানে গড়ে তুলতে পারলে হয়তো ক্ষুধা-দারিদ্র্য, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে একটি নতুন পৃথিবী সৃষ্টি হতে পারে। সে সম্ভাবনা এখন থেকেই আমাদেরকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

আর নয় অসম প্রতিযোগিতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অস্ত্রের ঝনঝনানি ও যুদ্ধ। সবাই মিলে আমরা এক কাতারে দাঁড়াতে চাই। আমাদের বিবেক, বিচার-বুদ্ধি, মেধা, পরিশ্রম সবকিছুকে আমরা মানুষের তথা এই পৃথিবীর কল্যাণে ব্যয় করতে চাই। আসুন সকলে বলি, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সকলেই ভাল থাকুক।

লেখক সিদীপের ম্যানেজার (স্পেশাল প্রোগ্রাম)

শিক্ষালোক

শিক্ষালোক সমাজে শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাভাবনার প্রসার, শিক্ষানুরাগী মানুষের মাঝে ভাববিনিময় ও নতুন চিন্তা উসকে দেওয়ার জন্য কাজ করছে। শিক্ষা নিয়ে আপনার ভাবনা এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। পুরনো স্কুল/কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক/শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উপর শ্রদ্ধার্ঘ্য, স্থানীয় পর্যায়ে যেকোন ব্যতিক্রমী শিক্ষা-উদ্যোগ, সৃষ্টিশীল পাঠদান কৌশল সহ শিক্ষা বিষয়ে আপনার মূল্যবান ভাবনা-চিন্তা লিখে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন।

ইমেইল: cdipbd@yahoo.com

আর্সেনিক দূষণ ও পরিশোধন

আইয়ুব হোসেন

আর্সেনিক এক ধরনের রাসায়নিক উপাদান। পৃথিবীপৃষ্ঠে স্বাভাবিক উপায়ে প্রাপ্ত খনিজ পদার্থগুলোর মধ্যে প্রাচুর্যতার দিক থেকে আর্সেনিক দ্বাদশতম। এ উপাদানটি ভূগর্ভস্থ খাবার পানিতে স্বল্পমাত্রায় সবসময় উপস্থিত থাকে। কিন্তু তা স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করলে পানকারীর শরীরে নানারকম রোগের উপসর্গ তৈরি করে। পরবর্তীতে তা প্রাণঘাতী হিসেবে দেখা দেয়। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দের একটি গবেষণায় ধারণা করা হয়, ৭০টিরও বেশি দেশে ১৩৭ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ খাবার পানিবাহিত আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত।[১] কিন্তু মাত্রাগতভাবে এই বৈশ্বিক বিপর্যয়কে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণ। বিবিধ কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলন ও ব্যবহার বেড়ে যাওয়া এর অন্যতম কারণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী ১ লিটার পানিতে ১০ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক থাকলে সেই পানি দূষিত তথা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশের মান অনুযায়ী ১ লিটার পানিতে আর্সেনিকের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম।[২]

আবিষ্কার

পশ্চিম বাংলার (ভারত) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপঙ্কর চক্রবর্তী সর্বপ্রথম ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে খাবার পানিতে আর্সেনিক দুষণের বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরেন।[৩] তিনি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম বাংলায় তাঁর গবেষণা শুরু করেন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন, যেখানে তিনি পানি, আক্রান্ত মানুষের নখ, চুল এবং প্রস্রাবের হাজারেরও বেশি নমুনা সংগ্রহ করেন। এ গবেষণায় তিনি ৯০০ জন গ্রামবাসীর শরীরে সরকারি গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রার আর্সেনিকের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন।

আর্সেনিক দূষণের কারণসমূহ

বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ খাবার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতির কারণ হিসেবে প্রথমদিকে অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে কৃষিতে অপরিকল্পিত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, শিল্প-কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন, আর্সেনিক যৌগ দ্বারা পরিশোধিত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের খুঁটি ইত্যাদি এই সমস্যার মূল কারণ। পরবর্তীতে উল্লিখিত প্রাক-ধারণাকে ভিত্তি করে গবেষণা পরিচালিত হলে এটা প্রতীয়মান হয়, এসকল কারণ বিস্তৃত এলাকায় দূষণ সৃষ্টিতে সক্ষম নয়। এরই মধ্যে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত 'ঢাকা ঘোষণা'য় জানানো হয় যে, ভূতাত্ত্বিক কারণ আর্সেনিক দূষণের জন্য দায়ী।[৪] এ তত্ত্বের প্রধান পথিকৃৎ অধ্যাপক দীপঙ্কর চক্রবর্তী। তিনি তাঁর দল নিয়ে মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ দল (ইউ.এস.জি.এস.)-এর সঙ্গে পশ্চিমবাংলা অঞ্চলে একটি যৌথজরিপ সম্পন্ন করে আবিষ্কার করেন যে, অতিমাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে ভূ-অভ্যন্তরে অক্সিজেন প্রবেশের ফলে পানিবাহী শিলাস্তরের আর্সেনিক পাইরাইট জারিত হয়ে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক তরল অবস্থায় যুক্ত হচ্ছে। সহজভাবে বলতে গেলে - দৈনন্দিন প্রয়োজনে ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলন ও ব্যবহার বেড়ে গেলে পানির স্তর আগের তুলনায় অনেক

১. Arsenic in drinking water seen as threat, Associated Press; আগস্ট ৩০, ২০০৭
২. সরকারকে নতুন উদ্যোগ নিতে হবে, বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ৭, ২০১০; পৃষ্ঠা- ১৫
৩. Drinking the water of death, David Bradley, The Guardian; জানুয়ারি ৫, ১৯৯৯
৪. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ড. মো. ময়নুল হক (সম্পাদিত), গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন ২০০৩; পৃষ্ঠা- ৩৩২

নীচে নেমে যায়। পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়াতে, পূর্বে মাটির যে সকল স্তর সবসময় পানির মধ্যে ডুবে থাকতো সেগুলো আর ডুবে থাকে না; ফলে মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে, আগে যেখানে পানি ছিল সেখানে বাতাস প্রবেশ করে। বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে যৌগগুলো জারিত (অক্সিডাইজড) হয়ে ভেঙ্গে যায়। ফলে পানিতে অদ্রবণীয় যৌগ থেকে ছুটে আর্সেনিক পানিতে দ্রবীভূত হয়ে এমন যৌগ গঠন করে। আর্সেনিক দূষণের এ মতবাদকে অক্সিডেশন থিওরি বা জারনতত্ত্ব বলা হয়।

পরবর্তীতে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডি.পি.এইচ.ই.) এবং ব্রিটিশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ দল (বি.জি.এস.) রিডাকশন থিওরি বা বিজারণ তত্ত্ব নামে আর্সেনিক দূষণের একটি বিকল্প তত্ত্ব উপস্থাপন করে। তাঁদের মতে, প্রক্রিয়াটি ব-দ্বীপ পলল ও নদীবাহিত পলল সমভূমির পলি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্সেনিকযুক্ত পলি বদ্বীপ ও পলল সমভূমি অঞ্চলে জমা হয়, যেখানে আর্সেনিকের বাহক হলো প্রধানত আয়রন অক্সিহাইড্রোক্সাইড নামের মনিক মিনারেল। পরবর্তীতে পলির সঙ্গে সঞ্চিত জৈব পদার্থ কর্তৃক অক্সিজেন আহরণের ফলে পানিবাহী শিলাস্তরে বিজারিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এসময় বিজারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয়রন অক্সিহাইড্রোক্সাইডের মধ্যে সংযোজিত (absorbed) আর্সেনিক ও আয়রন, ভূগর্ভস্থ পানিতে তরল অবস্থায় মুক্ত হয়। অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কারণে বর্তমানে এই তত্ত্বটি বেশি গ্রহণযোগ্য।[৫]

তবে রাসায়নিকভাবে জারণ বা বিজারণ উভয় প্রক্রিয়ায়ই মাটির অদ্রবণীয় খনিজ মৌল আর্সেনিক থেকে দ্রবণীয় আর্সেনিক যৌগ পাওয়া সম্ভব। তাই পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিজারণকে নির্দেশ করলেও জারণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা একেবারে অমূলক নয়। এখানে উল্লেখ্য যে জারণ তত্ত্বে যেমন পরীক্ষালব্ধ ফলের অভাব রয়েছে, অন্যদিকে বিজারণ তত্ত্বে কীভাবে এতোদিন পরে হঠাৎ করে এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে সে ব্যাপারে ব্যাখ্যার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

উল্লিখিত মতবাদদ্বয়ের পাশাপাশি সবুজ বিপ্লব তত্ত্ব বা গ্রীন রেভ্যুলিউশন থিওরি নামক আরেকটি মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। অধিকতর খাদ্য উৎপাদন ও পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য বহুল আলোচিত ও সমালোচিত এ সবুজ বিপ্লব তত্ত্ব অনুসারে, অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদনের জন্য উচ্চফলনশীল প্রজাতির হাইব্রীড বীজ (বিশেষত ধান চাষের ক্ষেত্রে) ব্যবহারের ফলে তার অনুষঙ্গ হিসেবে কৃষিজমিতে অধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ পানি ব্যবহার করতে হয়। জমিতে ব্যবহৃত এ অতিরিক্ত পানি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগভীর নলকূপ থেকে উত্তোলন করা হয়। এতে একদিকে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে, অন্যদিকে উচ্চমাত্রার সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে জমিতে থাকা অব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থগুলো (সার ও কীটনাশক) আস্তে আস্তে পানির সাথে চুঁইয়ে মাটির স্তরগুলোতে ঢুকে পড়ছে। এ রাসায়নিক পদার্থগুলো মাটির খনিজের সাথে বিক্রিয়া করে তা থেকে আর্সেনিক মুক্ত করে ফেলছে। পরবর্তীতে মুক্ত হওয়া আর্সেনিক চোঁয়ানো পানির সাথে ভূগর্ভস্থ পানিতে গিয়ে মিশে দূষণ সৃষ্টি করছে।

আর্সেনিক দূষণে সাম্প্রতিক সংযোজন জীবাণু তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনেকটা বিজারণ তত্ত্বের পরিপূরক। এতে বলা হয়, মাটিতে চুঁইয়ে সার ঢোকার ফলে সেখানে জীবাণু বেঁচে থাকার মতো বস্তুর সমাহার ঘটে। জীবাণুগুলো আশপাশের পরিবেশ থেকে, পানিতে দ্রবীভূত অন্যান্য যৌগ থেকে তাদের শ্বসনকার্যে ব্যবহৃত অক্সিজেন বা চার্জ সংগ্রহ করছে। এর ফলে সেখানে ঋণাত্মক জারণ-বিজারণ বিভব সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে আর্সেনিক ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে।

সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিশ্বব্যাংক এবং ইউনিসেফের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের ৭ বিলিয়ন লোকের মধ্যে প্রায় ১ বিলিয়ন লোক বিশুদ্ধ পানযোগ্য পানি সংকটে ভুগছে। পাশাপাশি গৃহস্থালী এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে ২.৫ বিলিয়ন লোক এই সমস্যায় আক্রান্ত। বর্তমান বিশ্বে পানিবাহিত রোগে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর সমস্ত হাসপাতালের প্রায় অর্ধেক শয্যাই পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত রোগির দখলে থাকে। সমস্ত রোগের মধ্যে প্রায় ৮৮% স্বাস্থ্যসম্মত পানির অভাবে সৃষ্ট। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ডায়রিয়ার মতো সহজ আরোগ্যগামী রোগেই প্রতিদিন মারা যায় প্রায় ৩ হাজার ৯ শ শিশু। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে আর্সেনিক সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা অববাহিকার প্রায় ৫৫ কোটি মানুষ আর্সেনিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় ৬ কোটি। এখানে আর্সেনিক দূষণের কারণে প্রতি হাজারে ১৩ জনের ক্যান্সারের আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে - ভূগর্ভস্থ পানির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা। নিকট-ভবিষ্যতে ভারতীয় সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক যদি টিপাইমুখে বাঁধ, হিমালয়কেন্দ্রিক অর্ধসহস্রের অধিক বাঁধ এবং আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় তাহলে এখানকার আর্সেনিক দূষণ ভয়ানক আকার ধারণ করবে।

৫. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ড. মো. ময়নুল হক (সম্পাদিত), গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন ২০০৩

তখন হয়তো দেখা যাবে, এই দেশের প্রায় ৮ থেকে ১০ কোটি মানুষ আর্সেনিক বিষ পানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মৃত্যুর নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হ্যাভার্ড এ্যাকশন প্ল্যান-১৯৬৬ অনুসারে, ভারতের নদীগুলোতে হিন্দুশাস্ত্র অনুসরণে মানুষসহ সকল প্রাণীর শবদেহ বা ভস্ম ফেলা হয়। এতে পানিতে যে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা ফারাক্কা ব্যারেজের ফলে নিম্নাঞ্চলের (অর্থাৎ বাংলাদেশের) ভূগর্ভস্থ সর্বনিম্ন স্তরে আটকে যাবে। কারণ নদীগুলোর যে বিপুল জলপ্রবাহ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, ফারাক্কা বাঁধের কারণে সেই প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় আর্সেনিক বিষ বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত যেতে পারবে না। ফলে ২০০২ সাল নাগাদ নিম্নাঞ্চলের প্রতিটি নলকূপেই আর্সেনিক বিষ নির্গত হতে বাধ্য।[৬]

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জের বড়ঘরিয়া ইউনিয়নের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়ে। এরপর ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভে বাংলাদেশের ৬১টি জেলার নলকূপের পানির নমুনা পরীক্ষা করে জানায় ৪২% নলকূপের পানিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানের চেয়ে বেশি মাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে। এরমধ্যে ২৫% নলকূপের পানিতে বাংলাদেশের মানের চেয়ে বেশি আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়ে।[৭] দেশের বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে খাওয়ার পানিতে আর্সেনিকে উপস্থিতির মাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলছে। ইউনিসেফ এবং ব্রিটিশ ডিএফআইডি-র সহায়তায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দুটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এতে তারা দেশের ৬১টি জেলার ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি খুঁজে পান। এগুলো মূলত অগভীর নলকূপ এবং এদের মধ্যে ২৮% নলকূপের পানিতে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য সীমার ওপরে তথা ০.০৫ মি.গ্রা./লি. মাত্রার ঊর্ধ্বে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, পানির পাশাপাশি এখন শাক-সবজি, কিছু কিছু ধান ও পশুর মাংসের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে আর্সেনিক। খাদ্যচক্রের মাধ্যমে এ বিষাক্ত মৌলটি গিয়ে জমা হচ্ছে মানুষের দেহে, যা ৫ থেকে ১৫ বছর পর মানবস্বাস্থ্যের পক্ষে বড় ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে বলে দাবি করেছেন গবেষকরা। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আর্সেনিক কবলিত এলাকায় পানি সেচের মাধ্যমে যেসব ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে তার অধিকাংশের মধ্যে আর্সেনিকের উপস্থিতি রয়েছে। সবচেয়ে বেশি আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে কচু, লাউশাক, লালশাক, ডাঁটাশাক, ঢেঁকিশাক, কলমিশাক ও টমেটোতে। ধানের মধ্যে মিনিকেট, বাসমতি, ব্রি-২৬, ব্রি-২৮ ও ব্রি-৩৫-এ। গম চাষে পানির চাহিদা কম বলে ধানের চেয়ে এ ফসলে আর্সেনিক কম জমা হয়।

খাবার পানিতে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি পরিমাণ আর্সেনিকের উপস্থিতি মনুষ্যস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, এমনকি তা মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখা দেয়। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ল্যানসেট সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রবন্ধে এ বিষয়টির উল্লেখ করা হয়। এখানে বলা হয়েছে, আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়। তবে পানিতে কী পরিমাণ আর্সেনিক আছে এবং একজন ব্যক্তি কতদিন যাবৎ এই পানি পান করছেন, তার ওপর মৃত্যুঝুঁকি নির্ভর করে। নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজারে পরিচালিত এ গবেষণায় দেখা গেছে, আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের কারণে সাধারণ রোগে গড়ে মৃত্যুঝুঁকি ২১% এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগে মৃত্যুঝুঁকি ২৪% বেড়েছে। দীর্ঘস্থায়ী রোগে মৃত্যুহার বৃদ্ধিতে আর্সেনিকের সম্পৃক্ততার ব্যাপারটি আগেও যুক্তরাষ্ট্র, চিলি, আর্জেন্টিনা, তাইওয়ান এবং বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলার মতলবে সম্পন্ন বিভিন্ন গবেষণায় পাওয়া গেছে। প্রতি লিটার পানিতে ১৫০ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক পান করার ফলে ক্রনিক ডিজিজ যথা - ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিসের মতো রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুঝুঁকি ৬৪% বেড়েছে। সাধারণ রোগে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুঝুঁকিও বাড়ে প্রায় সমপরিমাণে।[৮]

আর্সেনিকমুক্ত পানির বিকল্প উৎস

আর্সেনিকসহ যেকোনো দূষণ থেকে বাঁচার কার্যকর উপায় তার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বাংলাদেশের পরিবেশ-প্রতিবেশ ও বাস্তবতা অনুসারে আর্সেনিকমুক্ত পানি ব্যবহারের জন্য যেসকল বিকল্প উৎস বিবেচনা করা যায় তাহলো -

১. ভূ-উপরস্থ পানি: নদীনালা, হাওর-বাওর, খাল-বিল, পুকুর ইত্যাদি জলাশয়ের পানিতে আর্সেনিক নেই। তবে আর্সেনিকের উপস্থিতি না থাকলেও এসকল উৎসের পানিতে বিভিন্নরকম রোগ-জীবাণু আছে যা মানবেদেহের জন্য আর্সেনিকের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। তাই এ পানি যথাযথ উপায়ে পরিশোধনপূর্বক নিরাপদ করে গ্রহণ করতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বালু ও পাথরের ফিল্টার দিয়ে এ ধরনের জলাশয়ের পানি পরিশোধন করা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জলাশয়ের পানিতে বিভিন্ন শিল্পবর্জ্য,

৬. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ড. মো. ময়নুল হক (সম্পাদিত), গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন ২০০৩

৭. সরকারকে নতুন উদ্যোগ নিতে হবে, বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ৭, ২০১০; পৃষ্ঠা- ১৫

৮. ল্যানসেটের গবেষণা নিবন্ধ, "আর্সেনিক মানুষের মৃত্যুঝুঁকি বাড়াচ্ছে", দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, আগস্ট ৭, ২০১০

রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মিশ্রিত হয়ে পড়ায় এ পদ্ধতির ওপর পুরোপুরি ভরসা করা যায় না। কারণ, এতে পানির রাসায়নিক দূষণ দূর করা সম্ভব হয় না।

২. গভীর নলকূপ: বাংলাদেশের যেসকল স্থানের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অগভীর নলকূপ। গভীর নলকূপ এসব স্থানে আর্সেনিকমুক্ত পানির বিকল্প হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে আর্সেনিক দূষণের প্রক্রিয়া, বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক গড়ন এবং গভীর স্তর থেকে প্রচুর পানি উত্তোলন করা হলে অগভীর স্তরের পানি গভীর স্তরে চলে আসতে পারে। এ আশঙ্কার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে গভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতির মাধ্যমে। তাই আর্সেনিকমুক্ত পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গভীর নলকূপ নির্ভরযোগ্য বিকল্প উৎস হিসেবে স্বীকৃত নয়।

৩. বৃষ্টির পানি: ভূ-উপরস্থ পানির মধ্যে বৃষ্টির পানি সবচেয়ে শুদ্ধ। তবে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর ধুলোবালি থাকায় এ পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণার্থে বেশকিছু গবেষণামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, এ উৎসের প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, এদেশে বর্ষাকাল ছাড়া প্রায় বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য বেশ বড়সড় আকারের জলাধার তৈরি করতে হয়। সম্প্রতি বেশকিছু বেসরকারি সংস্থা স্বল্প খরচে গ্রামাঞ্চলে কংক্রিটের জলাধার তৈরিতে সহায়তা করছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় বছর জুড়ে আর্সেনিকমুক্ত বিকল্প পানির উৎস প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়। এক্ষেত্রে আর্সেনিকযুক্ত পানি উপযুক্ত পদ্ধতি ও প্রযুক্তির দ্বারা পরিশোধনের বিকল্প নেই।

আর্সেনিক দূষণ কবলিত অঞ্চলে আর্সেনিক সমস্যা সমাধানকল্পে বাংলাদেশ সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে -

১. নলকূপের পানি পরীক্ষা ও চিহ্নিতকরণ রং লাগানো;

২. আর্সেনিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

৩. আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্তকরণ;

৪. বিকল্প পানির উৎস পাওয়ার জন্য অনুসন্ধান এবং

৫. বিকল্প পানির উৎস কার্যকর করা।

আর্সেনিক দূরীকরণ প্রযুক্তি

বর্তমানে দেশে আর্সেনিকযুক্ত পানি থেকে আর্সেনিক মুক্ত করার সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী কিছু পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এরমধ্যে কিছু পদ্ধতি রাসায়নিক উপাদান-সহযোগে পরিচালিত এবং কিছু পদ্ধতি প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত উপাদান সহযোগে পরিচালিত। অঞ্চল ও উপাদানের সহজলভ্যতাভেদে একেকটি পদ্ধতি একেক অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১. সাধারণ বালুর ফিল্টার প্রযুক্তি

এটি ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক পর্যায়ে ব্যবহৃত একটি সহজ পদ্ধতি, যার আর্সেনিক দূরীকরণের হার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। এ পদ্ধতির উপকরণ - একটি বালতি বা ড্রাম, বালু, ছোট পাইপ ও একটি ট্যাপকল। বালতি বা ছোট ড্রামের ভেতরে প্রায় অর্ধেক বালু ভরে এবং সেই পাত্রের নিচের দিকে একটি কল লাগিয়ে এটি বানানো যায়। তবে কলটি সরাসরি বালু থেকে পানি নিলে বালি-মেশা পানি আসতে পারে। তাই বালতি বা ড্রামের তলে ফিল্টার পাইপের (নলকূপে যে ফিল্টার পাইপ ব্যবহৃত হয়) ছোট একটা টুকরা আনুভূমিকভাবে শুইয়ে দিয়ে এক দিক কলের সাথে লাগিয়ে এবং অপর দিক বন্ধ করে দিয়ে, তার ওপরে বালু ভরে দিলে পরিষ্কার পানি পাওয়া যায়। টুকরা ফিল্টার পাইপের একমাথা বন্ধ করার জন্য পলিথিন দিয়ে মুড়ে আঠালো টেপ দিয়ে আটকে দেয়া যায়। অপর মাথা হতে কলের মাথা (যা বালতি বা ড্রামের ভেতরে থাকবে) পর্যন্ত আরেকটি পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে দুদিকেই আঠালো টেপ দিয়ে আটকে দেয়া যায়। এ পদ্ধতিতে ব্যবহারের মাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট সময় তথা এক মাস পরপর বালু পরিবর্তন আবশ্যক। এতে অধঃক্ষেপ আকারে আর্সেনিক দূর হয় এবং বালুর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে সেই অধঃক্ষেপগুলো বালুর ওপরে এবং ভেতরে আটকে গিয়ে আর্সেনিক দূরীভূত হয়।

২. সনো ৩-কলসি পদ্ধতি

ছোট পরিসরে ব্যবহার-উপযোগী একটি জনপ্রিয় প্রযুক্তি সনো ৩-কলসি পদ্ধতি। এতে উপকরণ হিসেবে লোহার

গুড়া, ইটের ছোট টুকরা, বালু ও কয়লা ব্যবহার করা হয়।

এ পদ্ধতিতে ৩টি মাটির কলসি একটার ওপরে আরেকটি বসানো হয়। ওপরের দুটি কলসির তলে পানি পড়ার জন্য একটি করে ফুটো থাকে, ফুটোগুলোর ওপরে একটা সিনথেটিক কাপড় আর কিছু ইটের টুকরো দেয়া হয় যেন কলসে অবস্থিত অন্য বস্তু পড়ে না যায়। মাঝের কলসে কয়লা, বালু ও ইটের ছোট টুকরার মিশ্রণ (২ কেজি + ১ কেজি + ২ কেজি) থাকে। ওপরের কলসে ৩ কেজি ঢালাই লোহার গুঁড়া/কণার উপরে ২ কেজি বালু বিছিয়ে দেয়া থাকে। এই কলসে যে পানি ঢালা হয় তা পর্যায়ক্রমে বালু, লোহার গুঁড়া, কয়লার মিশ্রণের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে আর্সেনিকমুক্ত হয়ে নিচের কলসে গিয়ে জমা হয়।

আর্সেনিক কবলিত এলাকায় পানি সেচের মাধ্যমে যেসব ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে তার অধিকাংশের মধ্যে আর্সেনিকের উপস্থিতি রয়েছে। সবচেয়ে বেশি আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে কচু, লাউশাক, লালশাক, ডাঁটাশাক, ঢেঁকিশাক, কলমিশাক ও টমেটোতে। ধানের মধ্যে মিনিকেট, বাসমতি, ব্রি-২৬, ব্রি-২৮ ও ব্রি-৩৫-এ।

---

৩. আয়রন ক্লোরাইডযুক্ত কেমিকেল পদ্ধতি

এটি একাধারে পারিবারিক ও পাড়া পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে সহযোজন-অধঃক্ষেপন প্রক্রিয়ায় আর্সেনিক দূর করা হয়। উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় আয়রন ক্লোরাইড নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ, বালতি, ব্লিচিং পাউডার ও বালু। প্রথমে ওপরের বালতিতে কল বন্ধ করে ২০ লিটার পানি ভরে তার মধ্যে পরিমাণমত আয়রন ক্লোরাইড দিতে হয়। এরপর একটি বড় ঘুটনি বা নাড়ুনি দিয়ে ভাল করে গুলিয়ে দিতে হয়। কয়েকবার ঘুরিয়ে নাড়তে হবে যেন বালতির ভেতরে পানি চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ (২৫-৩০ মিনিট) রেখে দিলে, কেমিক্যাল পদার্থ থেকে পানিতে অদ্রবণীয় কণার মত বস্তু তৈরি হয় এবং এর গায়ে আর্সেনিক লেগে গিয়ে বালতির তলায় জমা হয়। এরপর বালতির কল খুলে দিলে কলে লাগানো পাইপ দিয়ে পানি নিচের বালুর ফিল্টারযুক্ত বালতিতে পড়ে। এতে বালতির তলা থেকে বা অন্য কোন উপায়ে উক্ত কেমিক্যালের অধঃক্ষিপ্ত বস্তু চলে আসলে তা বালুতে আটকে যায় এবং বালুর ভেতর দিয়ে পরিষ্কার আর্সেনিকমুক্ত পানি নিচের কলে চলে আসে। এ পদ্ধতিতে কেমিক্যালের সাথে সামান্য ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হয়, যা পানি বা বালুতে জীবাণু থাকলে তা মেরে ফেলে। অন্যদিকে, পাড়া পর্যায়ে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্র আকারে অনেক বড় এবং এখানে রাসায়নিক পদার্থ মেশাতে অনেক বেশি শক্তির দরকার হয়। ট্যাংকটিতে সাধারণত বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে পানি ভরা হয়। এরপর এতে রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে ট্যাংকের ভেতরে ঘূর্ণনক্ষম পাখার মত নাড়ুনির সাথে সরল গিয়ার চাকা দিয়ে যুক্ত হাতল ঘোরানো হয় এবং কিছুক্ষণ পর থেকে পাশের ছোট ফিল্টার হাউজ থেকে পানি সংগ্রহ করা যায়।

৪. পাথর-বালুর ফিল্টার নলকূপ

এটি পাড়া বা মহল্লা পর্যায়ে ব্যবহারোপযোগী একটি কার্যকর পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক উপায়ে পানির আর্সেনিক দূর করা হয়। এতে কোন অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য দরকার নেই। কেবল পাথর-বালু দিয়ে একটি ফিল্টার এবং তার সাথে নলকূপের পানির সাথে বাতাস সংমিশ্রণের জন্য ঝাঁঝরি প্লেট বা দেয়ালের ওপর দিয়ে নালা তৈরি করা একটা চৌবাচ্চার মতো কাঠামো তৈরি করে তার মধ্য দিয়ে পানি শোধন করে নিতে হয়। এতে আর্সেনিক অধঃক্ষিপ্ত হয়ে পানি থেকে অপসারিত হয়। পাথর বালুর এ ফিল্টার পদ্ধতি বাংলাদেশের আর্সেনিকপ্রবণ অঞ্চলগুলোর জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো সমাধান হতে পারে। কারণ এতে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত লৌহকে ব্যবহার করে সহযোজন-অধঃক্ষেপ-পরিস্রাবন পদ্ধতিতে আর্সেনিক দূর করা হয়। এ পদ্ধতিতে পানি শোধনাগার চৌবাচ্চায় ইনলেট বা প্রবেশ প্রকোষ্ঠ, দুই বা তিনটি ছোট পাথরের রাফিং ফিল্টার, একটি বালুর স্লো স্যান্ড ফিল্টার এবং পানি জমা রাখার জন্য জলাধার থাকে। নলকূপের পানি ইনলেটে প্রবেশ করার আগে এর সাথে বায়ু তথা অক্সিজেনের মিশ্রণের ফলে উঁচু ঝাঁঝরির মত প্লেট দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা আকারে ইনলেটে পড়ে। এভাবে বায়ু সংযোগ বাড়াতে নলকূপটি একটু উঁচুতে স্থাপন করতে হয়। তাই নলকূপে চাপ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় প্লাটফর্মটিও উঁচু করতে হয়। অন্যভাবে বাতাসের সংস্পর্শ বাড়াতে এই শোধনাগারের পার্শ্বদেয়ালের ওপর দিয়ে একটি অগভীর নালা করা হয় যা দিয়ে নলকূপের পানি বেশ কিছুদূর ঘুরে এসে ইনলেটে পড়ে। ইনলেটের ভেতরে জারিত লৌহ অদ্রবণীয় কণাতে পরিণত হয়ে অধঃক্ষিপ্ত হয় অথবা পরবর্তী পাথরের ফিল্টার প্রকোষ্ঠে আটকে অপসারিত হয়। এই অদ্রবণীয় লৌহকণার গায়ে আর্সেনিক সহযোজিত হয়ে একইসাথে অপসারিত হয়।

পানি সংগ্রহকারীকে তার পাত্র কলের নিচে রেখে কল ছেড়ে দিতে হয়। পানি ভরার অবসরে, নলকূপ চেপে কিছু পানি

প্রবেশ করাতে হয় পরিশোধন যন্ত্রে। অধঃক্ষিপ্ত লৌহ-আর্সেনিকের গাদ পাথরের ফিল্টারে আটকে যায় বলে পানি দিয়ে তা অপসারণ করতে হয়। মাঝে মাঝে এটাকে পরিষ্কার করতে হয়। পরিষ্কার করার জন্য পাথরের ফিল্টার প্রকোষ্ঠের নিচের ওয়াশআউট ভাল্বগুলো কিছুক্ষণের জন্য খুলে দিতে হয়; এতে গাদ মিশ্রিত লাল ঘোলা পানি বেরিয়ে আসে ও ড্রেন দিয়ে একটি গর্তে চলে যায়। চাপভেদে ৭-১০ দিনে একবার এরকম পরিষ্কার করতে হয়। এছাড়া বছরে এক বা দুইবার পাথরের প্রকোষ্ঠের সমস্ত পাথর পরিষ্কার করে আবার প্রকোষ্ঠের ভেতরে পুনঃস্থাপন করতে হয়। এ পদ্ধতিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি সামান্য সময়সাপেক্ষ হলেও এর প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সহজলভ্য এবং পরিচালন ব্যয় নেই বললেই চলে।

আর্সেনিকমুক্তকরণে অন্যান্য প্রযুক্তি

অ্যাক্টিভেট অ্যালুমিনা, গ্রানুলার ফেরিক হাইডোক্সাইড ইত্যাদি বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান ছাড়াও অ্যাক্টিভেট কার্বন বা সক্রিয় কয়লা সহযোগে সহযোজন ফিল্টার পদ্ধতিতে পানিকে আর্সেনিকমুক্ত করার প্রযুক্তি রয়েছে। এর মধ্যে সক্রিয় কয়লা

স্থানীয়ভাবে সহজেই উৎপন্ন করা সম্ভব বলে এ প্রযুক্তিটি অধিক সম্ভাবনাময়।

প্রতিরোধক ব্যবস্থা

আর্সেনিক বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি লাভে এখন পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়নি, তাই এক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাই উপযোগী। আর্সেনিক দূষণ থেকে মুক্তি পেতে যা করা যেতে পারে সংক্ষেপে তাহলো -

- আর্সেনিকযুক্ত নলকূপের পানি পান ও রান্নার কাজে ব্যবহার না করা।
- কাছাকাছি আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ পাওয়া না গেলে পুকুর বা নদী হতে পানি এনে তাতে ১ কলসি পরিমাণ পানির জন্য আধা চামচ ফিটকিরি মিশিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। এরপর ওপর থেকে তলানিবিহীন পরিষ্কার পানি পান করতে হবে।
- বৃষ্টির পানি আর্সেনিকমুক্ত। তাই বৃষ্টি আরম্ভ হবার ৫ মিনিট পর সরাসরি পরিষ্কার পাত্রে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে তা পান করা যেতে পারে।
- এছাড়া আর্সেনিকযুক্ত পানি পরিশোধনে সাম্প্রতিককালে যেসকল সহজলভ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তপন বিহারী নাগ

শিক্ষায় নিবেদিত প্রাণ

এডভোকেট তপন বিহারী নাগ একজন শিক্ষানুরাগী মানুষ। কুমিল্লায় আইন পেশা থেকে তাঁর যা আয়, তার একটা অংশ তিনি দরিদ্র ও মেধাবী ছেলেমেয়ের পড়ালেখার জন্য ব্যয় করেন। সম্প্রতি, কুমিল্লার ৫টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্ররা যাতে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে, সেজন্য তিনি বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। দরিদ্র পরিবারের যেসব ছেলেমেয়ে প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষায় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাবে, তারা প্রত্যেকে ১,০০০ টাকা বৃত্তি লাভ করবে। বরুরা উপজেলায় ঝলম হাইস্কুল, ঝলম হাইস্কুল এন্ড কলেজ, মাহিদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং চান্দিনা উপজেলার বরুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বরুরা হাইস্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি থেকে ১২ জন করে মোট ৬০ জন শিক্ষার্থী এ বৃত্তি পাবে। একইভাবে আইনজীবীদের সন্তান যারা পিএসসি ও জেএসসির বৃত্তি পরীক্ষায় ভাল ফল করবে তাদের ২৪ জনকে একই হারে বৃত্তি দেওয়া হবে। তাঁর পিতা মাখনলাল নাগের নামে প্রতিষ্ঠিত একটি ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এসব বৃত্তি দেওয়া হবে। কুমিল্লার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর এ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, সমাজের আরও অনেকে তাঁর এ কাজ থেকে অনুপ্রেরণা পাবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টেরস্নাতক সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরধারী মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়ার জন্য তার নামে দুটি ট্রাস্ট ফান্ড চালু করেন। এ উপলক্ষ্যে গত ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের কার্যালয়ে উক্ত দুটি ট্রাস্ট ফান্ডের জন্য ১০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

এডভোকেট তপন বিহারী নাগ গত তিন দশক ধরে কুমিল্লায় আইন পেশায় জড়িত। মনে হতে পারে অনেক টাকা আয় করেন বলে তিনি কিছু সমাজের জন্য ব্যয় করেন। আসলে টাকা জমিয়ে বড়লোক হওয়া তাঁর ইচ্ছে নয়। নিজের চাহিদা পূরণের পর যে উদ্বৃত্ত তা তিনি দরিদ্র মেধাবী ছেলেমেয়ের শিক্ষার কাজে ব্যয় করছেন। তিনি বলেন, 'সমাজের কল্যাণে কিছু না করতে পারলে বড়লোক একটা কথার কথা। আমার পারিবারিক প্রয়োজনে টাকা লাগে সত্য। কিন্তু বাড়তি টাকাটা আমি দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার কাজে লাগাতে চাই।'

রং ও রূপের চিত্রল কাব্য

আলমগীর খান

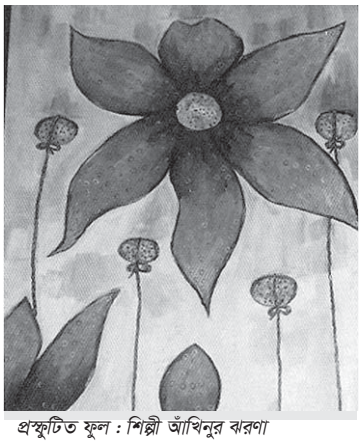

প্রস্ফুটিত ফুল : শিল্পী আঁখিনুর ঝরণা

চেতনায় তোমার রূপের বিভাস : শিল্পী স্বপন আচার্য

২৮ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় চিত্রশালায় 'রং ও রূপের কাব্য' শীর্ষক একটি চিত্রপ্রদর্শনী হলো। এটি চট্টগ্রাম চারুশিল্পী পর্ষদ-ঢাকা-এর ৭ম শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। চট্টগ্রামের বিভিন্ন চারুকলা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ঢাকায় বসবাস করছেন সংগঠনটি তাদের মিলনকেন্দ্র। একটি ভয়ানক রাজনৈতিক অস্থিশীলতার মধ্যে বেশ কিছু অনিশ্চয়তা ঘাড়ে করে এবার তাদেরকে এ আয়োজনটি করতে হয়েছে। সহজ ও স্বাভাবিক মতদ্বৈততা যে উগ্র সংহিস মতান্ধতায় পরিণত হতে পারে সে নির্মম বাস্তবতায় শিল্পীগণ ব্যথিত। রাজনীতির এ বেদনার্ত রূপ তাদের রং ও রূপের কাব্যেও একটি ধূসর ছায়া ফেলেছে। প্রায় অর্ধশত শিল্পীর দেড়শোর মতো শিল্পকর্ম নিয়ে ছিল এ প্রদর্শনী। তেল রং, জল রং, অ্যাক্রিলিক, মিশ্রমাধ্যম, কয়লা, কলম-কালি, টেরাকোটা প্রভৃতি বিচিত্র মাধ্যমে তারা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। যাদের কাজ এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে চট্টগ্রাম চারুকলার অধ্যক্ষ শিল্পী হাসি চক্রবর্তী প্রয়াত।

রং ও রূপের এ উৎসবেও জীবনের অনুষঙ্গ মৃত্যু ও ধ্বংস এড়ানো যায়নি। তাই এতে ছিল সমস্যাসঙ্কুল জীবন, আর্ত মানবতা, অগ্নিবলয়, জ্বলন্ত যানবাহন, বিস্ফোরণ, অবরুদ্ধতা ইত্যাদির চিত্রল প্রতিফলন। বসন্তের শান্ত-সৌম্য প্রতিবেশ ও আনন্দ হিল্লোল ছাপিয়ে এতে বিশৃঙ্খলারও ঢেউ লেগেছে। ঐতিহাসিক চেতনা বহন করে ছিলো একাত্তরের লাঞ্ছিত নারী। শোষণ-বঞ্চনা ও অবজ্ঞার চিহ্ন নিয়ে ছিলো পোষাকশিল্পের বস্ত্রবালিকা। সুরারোপ, স্বপ্নডিঙ্গা, নারীর সৌন্দর্য্য, ষড়ঋতুর উচ্ছ্বাস, শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন কাজে শক্তির স্ফূরণ, মুখোশ, মানবমনের জটিল অবয়ব, শান্ত পল্লী, এসব বৈচিত্র্যে প্রদর্শনীটি সমৃদ্ধ ছিলো। আসফল বীজ, পাত্র পুরাণ, মহাভারত, বর্ণিল ঐতিহ্যের আলেখ্য নিয়ে এখানে শিল্পীরা জীবনের মানে খুঁজেছেন। সময় যতই জানুফাটা হোক, এ প্রদর্শনীতে জীবন ও প্রকৃতির গান সর্বনাশের প্রবণতার কাছে হার মানেনি।

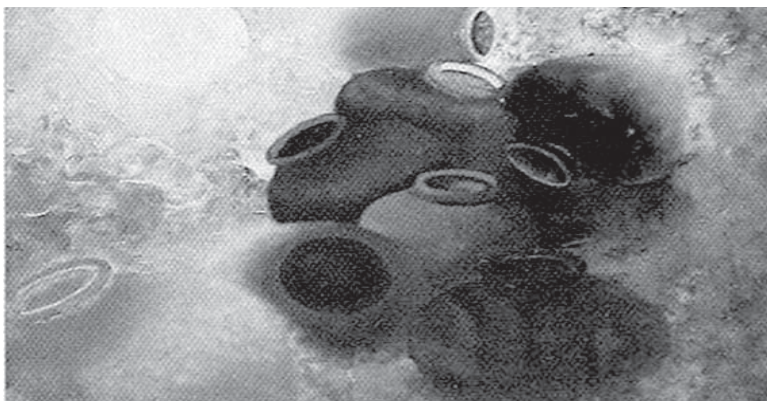

পাত্র-পুরান : শিল্পী সেহেলী

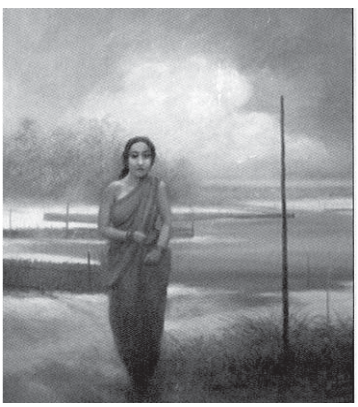

ক্ষণিকা : শিল্পী শেখর মন্ডল